শারদীয়া
2016
RiyaButu.com

শারদীয়া

লিটল ম্যাগাজিন

2016

Title: SARADIYA. Bengali little Magazine.
© All right reserved by the riyabutu.com. There is no hard copy of this book. Be aware of pirated copy. Date: 30th September 2016

Riyabutu.com

প্রস্তাবনা

শরতের ডাকে

নমস্কার,
শরতের ভোরের শিশির ভেজা ঘাসের উপর শিউলি ফুল যখন গড়িয়ে পড়ে, আর ভোরের সোনালী আভা গায়ে মেখে ঘুমিয়ে থাকে, তখন দুরের নীল আকাশ চোখ মেলে চেয়ে দেখে প্রকৃতির নৈসর্গিক রূপ।

মৃদু মন্দ হাওয়া কাশ ফুলের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়ায় প্রতিক্ষণ। সুদূর পর্যন্ত বয়ে গিয়ে বারে বারে ফিরে আসে শরতের টানে। এক ঝাঁক প্যাঁজা তুলার মত টুকরো টুকরো সাদা মেঘ বুকে নিয়ে সুনীল গগন ঝুঁকে পড়ে পৃথিবীর বুকে শরতের টানে।

চারিদিকে দুরন্ত প্রেমে ছুটে চলে উৎসবের আমেজ। চারিদিকে লেগে থাকে শরতের ছোঁয়া।

এমন মনমোহক দিনে পারিনি একা ঘরে বসে থাকতে। কিছু একটা গড়া-ভাঙ্গার নেশায় নিজেকে মেলে দিতে চেয়েছি একটা ক্ষুদ্র প্রজাপতির মত সবার মাঝে। সবাই নিঃস্বার্থ ভাবে সাড়াও দিয়েছেন অফুরন্ত ভালবাসা, আদর, স্নেহ নিয়ে।

বর্তমান টেকনোলোজির বদৌলতে Facebook এর প্রচুর বন্ধু-বান্ধবী দেশ-বিদেশ থেকে এমন ভাবে সাড়া দেবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। তাদের অনেকের সাথেই কখনো দেখা হয়নি। হয়তো কোনদিন দেখাও হবে না। তবু সবাই এক ডাকে যে ভাবে কাছে চলে এসেছেন তাতে আমি সত্যি খুব আবেগ আপ্লুত। তাদের সবাইকে জানাই অসংখ্য-অসংখ্য ধন্যবাদ।

এই করণেই মনে করি দায়িত্বটাও বেড়ে গেল বহুগুণ। আপ্রাণ চেষ্টা করেছি এই ছোট্ট শারদীয়া সংখ্যাটিকে যতটুকু সম্ভব ত্রুটি মুক্ত রাখতে। কিন্তু পারলাম কৈ? ত্রুটি মুক্ত হওয়া বড়ই দুঃসাধ্য।

তাই পাঠক - পাঠিকাদের কাছে নানাহ ভুল ভ্রান্তির জন্য হৃদয়ের গভীর থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর সবার কাছে বিনীত অনুরোধ করছি মতামত জানানোর জন্য, যেন পরের সংখ্যাটিকে আরো সুন্দর, উপযুক্ত করে তুলতে পারি।

এই শারদীয়া সংখ্যাটি eBook রূপে আমার Website, RiyaButu.com এ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। যে কেউ বইটিকে Free Download করে পড়তে পারবেন। Download করার জন্য path টি হল http://riyabutu.com/buy-e-book.php অথবা http://riyabutu.com/tripura-song-download.php
RiyaButu.com এর Story & Poem বিভাগে প্রতিনিয়ত গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয়। পাঠক পাঠিকাদের কাছে নতুন লেখা আশা করছি। আবার এই Website এর মাধ্যমে আপনি আপনার লেখা বই বিক্রিও করতে পারেন।

এই শারদীয়া সংখ্যাটির প্রতিটি গল্প, কবিতা বা রচনা তাদের লেখক বা কবিদের নিজস্ব সম্পত্তি। দয়া করে কেউ তাদের অনুমতি ছাড়া তাদের গল্প, কবিতা বা রচনা প্রকাশ করবেন না।

এই শারদীয়া ebook টির কোন Hardcopy নেই আর থাকবেও না। ফলে দয়া করে কেউ এই বইটি ছাপানোর চেষ্টা করবেন না।

সমস্ত পাঠক-পাঠিকা, লেখক, কবি ও রচনাকারদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, স্নেহের ঋতু শরৎ সবার কাছে মঙ্গলময় হয়ে উঠুক, সবাই সুস্থ থাকুন, ভাল থাকুন।

- ইতি
হরপ্রসাদ সরকার, ধলেশ্বর, আগরতলা।
Facebook account: Nagendra Sarkar.
Email:- ncsarkarsarkar@gmail.com

সূচীপত্র

স্বর্ণ প্রাপ্তি.....1

পরাধীন স্বাধীনতা.....4

সাবমেরিন ক্যাবল.....7

পুজো নয় বন্ধুতা তোমাকে.....10

অবশেষে পাওয়া গেল.....11

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প.....12

মেঘ.....15

কবিতা.....16

কুইজ.....17

কৃষ্ণচূড়া রূপ তোমার.....19

চুটকি হাসি.....20

কোন দেশের পরি তুমি.....22

তোমার মনে.....23

খারাপ সময়.....24

বুড়ি ভিখারি.....26

দুই মেঘ.....34

কোকিল পাখীর গান.....36

কুসুমজবার ঘাট 38

হিংসুটে পাতা.....42

অপুর কথা.....44

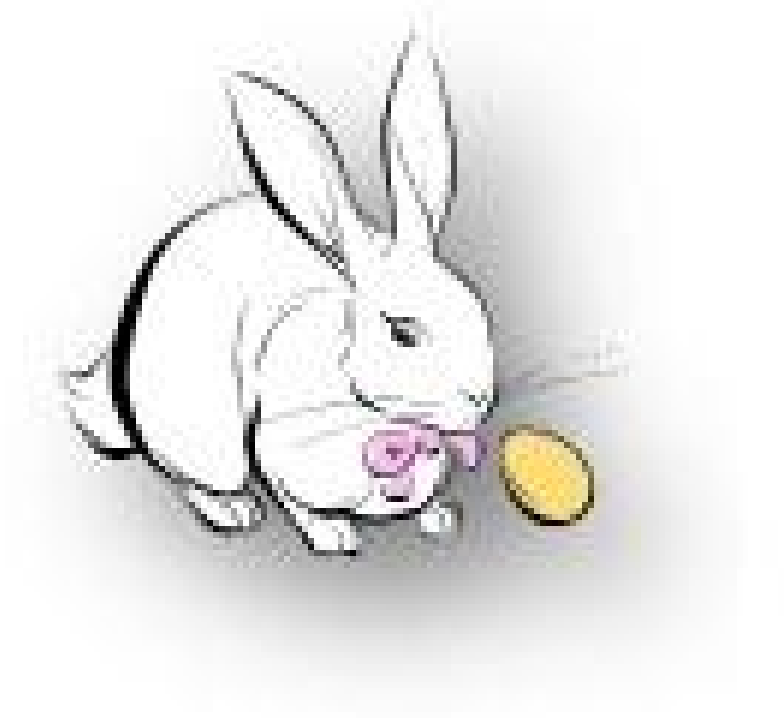

স্বর্ণ প্রাপ্তি

- রিদিতা দাস, তেলিয়ামুড়া, ত্রিপুরা, ভারত।

এক গ্রামে একটি ছেলে ছিল রাজু। সে ছিল আলসি আর গপ্পখোর। দিন রাত সে বন্ধু বান্ধবদের বাজে আড্ডায় ঘুরে বেড়ায়। ঘরে এসে খায়-ঘুমায় আবার বেড়িয়ে পরে। তার বাবা অতি কষ্টে দিন মজুরি করে সংসার চালায়, রাজু সে খবর রাখে না।

একদিন রাজুর বাবা চোখ বুজলেন। রাজু পড়ল অথৈ জলে। বৃদ্ধ মা আর ছেলের সংসার কোন ভাবেই চলে না। একদিন খাওয়া জোটে তো অপরদিন খাওয়া জোটে না। আরাম আয়েস এবার রাজুর পিছনে কালসাপ হয়ে দৌড়াতে লাগল। রাজু দিশাহারা হয়ে দিন রাত এদিক ওদিক ছুটা-ছুটি করতে লাগল, তার চোখের জল আর নাকের জল এক হল, কিন্তু কোন লাভ হল না।

সে যে কাজেই যায় সেখানেই দুর-দার সইতে হয়। আবার কেউ কেউ এক দুই ঘা লাগিয়ে তাড়িয়ে দেয়। কারণ- রাজু কাজ জানে না দু পয়সার, কিন্তু বিজ্ঞ আলাপ তার হাজার টাকার। তার উপর আবার যেখানে সুই না লাগবে সেখানে কুড়াল লাগিয়ে, কাজের ও সম্পত্তির খুব লোকসান করে। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে তার ভিক্ষা করে খাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না।

তেমনি এক দিনে সে খবর পেল যে গ্রামের শেষ কোনে, বড় মাঠটিতে মাটি খুঁড়ে অনেকেই নাকি ছোট বড় তরতাজা সোনার টুকরা পাচ্ছে। গ্রামের সব মানুষ সেই মাঠটিতে গিয়ে পড়েছে। রাজুও গেছে। সে দেখল, বিশাল বড় মাঠ, এপার ওপার দেখা যায়না। প্রচুর লোক কোদাল-গেনতি নিয়ে মাটি খুঁড়ছে।

রাজু বাবু সেজে মাঠে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। সে ভাবতে লাগল- ‘ সব বাজে কথা। কারোর কিছুই মিলবে না। ’

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে এল। সন্ধ্যার ঠিক আগে সবাইকে অবাক করে, রাজুর ঠিক সামনেই অনেকেই বেশ ছোট-বড় সোনার টুকরা পেল। আর সোনার টুকরা পেতেই চারিদিকে হাহাকার পরে গেল।

পরদিন ও আবার একই অবস্থা। রাজু মাঠে গিয়ে বাবুর মত ঘুরতে লাগল। ভাবল – ‘ দেখি আজ কি হয়? আজ হয়তো কারোর কিছুই মিলবে না। একদিন পাওয়া গেল বলে কি রোজ রোজ পাওয়া যাবে?’ কিন্তু আজো সন্ধ্যার ঠিক আগে রাজুর সামনেই আরো কয়েকজন সোনার টুকরা পেল।

রাজু বাড়িতে এসে রাতে শুয়ে শুয়ে হিসাব করতে লাগল- ‘ সবাই সোনার টুকরা সন্ধ্যার ঠিক আগেই পাচ্ছে। কাল আমিও কোদাল নিয়ে যাব। ’ আর নিজের হিসাব মত সে সন্ধ্যার ঠিক আগে কোদাল নিয়ে মাঠে গেল আর মাটি খুঁড়তে লাগল। কিন্তু বাকিরা সোনার টুকরা পেলেও সে কিছুই পেল না। পর দিনও ঠিক একই অবস্থা। রাজু সন্ধ্যার ঠিক আগে গিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল কিন্তু অনেকে সোনার টুকরা পেল, রাজু পেল না। এমনি চলল আরো তিন চারদিন। গ্রামের প্রায় সবাই কিছু না কিছু পেল। শুধু রাজুই কিছু পেল না।

ঐ সময়েই সেই গ্রামে এক মহা-সাধকের আগমন ঘটল। তিনি খুবই সিদ্ধপুরুষ ও জ্ঞানী। অনেকেই উনার কাছে গিয়ে নিজের নিজের দুঃখ-কষ্টের নিবারণের উপায় জেনে এল। রাজুও গেল। সে নিজের দুঃখের কথা বলে খুব কাঁদল। কিন্তু সেই সাধক এক বিন্দু ও বিচলিত হলেন না। তিনি বললেন, গ্রামের সবাই তো সোনার টুকরা পেল, তুমি পেলে না?

- ‘আমার ভাগ্য খারাপ গুরুদেব। আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গিয়ে মাটি খুঁড়েছি কিন্তু কিছুই পাইনি। ’

সাধক হেসে বললেন, ‘ কেন? তুমি সন্ধ্যার সময় কেন গিয়েছিলে? সকাল বেলাতে কেন যাওনি? ’

– ‘ সকাল বেলায় গিয়ে কি লাভ হত? সোনার টুকরা তো সন্ধ্যার সময়ই পাওয়া যেত! ’

এই কথা শুনতেই সাধক রেগে লাল হয়ে গেলেন। তিনি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে তেড়ে উঠলেন, ‘ রে মূর্খ, নিজেকে খুব চালাক ভাবিস। চালাকির দ্বারা কখনো কি মহৎ কাজ হয়? ভেবে দেখ, নিজের দিকে চেয়ে দেখ, তুই কি সোনা পাবার মত পরিশ্রম করেছিস? যারা ঐ মাঠে সারাদিন হার খাটুনি খেটেছে তারাই সোনা পেয়েছে। তুই কতটুকু মেহনত করেছিস যে সোনা পাবি? সোনা পেতে গেলে সোনার মত পরিশ্রম ও করতে হয়, চাপ-তাপ সহ্য করতে হয়। যাঃ দূর হ, মূর্খ, দূর হ এখান থেকে। তোর কাছে থাকাও পাপ। ’ সাধক লাঠি হাতে তেড়ে আসতেই রাজু ভয়ে পালিয়ে গেল।

সাধক পিছনে পিছনে আরো জোরে চেঁচিয়ে বললেন – ‘ মাঠে গিয়ে আবার দুই দিন বাবুর মত ঘুরে বেড়ানো! সুযোগ কি বার বার আসে রে মূর্খ! আবার যদি এদিকে আসিস তবে তোর ঠ্যাং আমি ভেঙ্গে ফেলব। ’

পরদিন সকালে গ্রামবাসীদের সাথে রাজুও কোদাল-সাবল নিয়ে মাঠে গেল। কিন্তু হায়, তারা দেখল যে বিশাল পরিমাণে রাজার সেনা হাতিয়ার নিয়ে সেই মাঠটিকে ঘিরে রেখেছে। কাউকে সেই মাঠের কাছেই ঘেঁসতে দেয়নি তারা। রাজু আর কোন সুযোগই পেল না।

একে একে গ্রামের সবার দিন ফিরল, কিন্তু রাজু তেমনি কি তেমনিই রয়ে গেল।

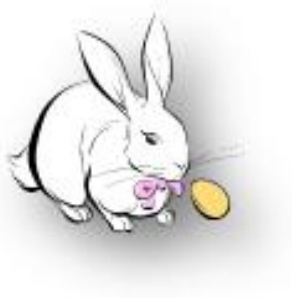

অনুগল্প

পরাধীন স্বাধীনতা

- সুধাংশু চক্রবর্তী, হালি সহর, উত্তর ২৪- পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

সমিতের হতাশায় ভরা মুখখানার দিকে তাকিয়ে ধ্রুব বলল - 'অত চাকরি চাকরি করছিস কেন?'

- 'কি করবো বল? বাড়িতে ঢুকতে আর ইচ্ছে করে না। আমাদের সংসারে আজ শুধু নেই নেই আর নেই। কি করে যে ভাতের হাড়ি উনুনে চাপছে জানি না। এও জানি না এভাবে আর কতদিন সংসার চলবে।'

- 'কেন, তোর দাদা তো চাকরি করে। কোন একটা বড় কারখানায়। তুই বলেছিস।'

সমিত কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে অবশেষে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে - ' দাদার কারখানাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মা - বৌদির গহনা বেচে দিন চলছে আমাদের। এদিকে বাবা কি একটা কঠিন অসুখ বাঁধিয়ে বসেছেন। বলতে গেলে বিনা চিকিৎসায় শয্যাগত। পাড়ার হাতুড়ে ডাক্তারের ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে। জানি না আদৌ সুস্থ হয়ে উঠবেন কি না। বৌদি তার সদ্যজাত শিশুর মুখে শুকনো স্তন গুঁজে দিয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করে।'

- 'তোর বোন তো কলেজে পড়ে। সে কি কড়ছে?'

- ' কি জানি কি করে। সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। কোথায় যায় কি করে ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।'

স্বপনদা দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে সমিতকে কষে দাবড়ানি দিলো - 'কেবল চাকরি চাকরি করলেই কি চাকরি মেলে? কাজ করতে হবে। আমরা দলের কাউকেই বেকার রাখব না। কিন্তু তোদের কর্তব্যও তো তোরা করবি। নাকি কেবলই চাকরির ধান্দায় থাকবি।'

স্বপনদাকে আড়ালে সবাই প্রফুল্লদার দালাল বলে। প্রফুল্লদাকে ধরে মোটা মাহিনার একটা চাকরি বাগিয়েছে গত ইলেকশনের আগে। অফিসের কাজ কামাই করে দিন রাত পার্টির কাজ নিয়ে পড়ে থাকে। এ বছর নাকি একটা প্রমোশনও পেয়েছে। সবাই জানে এ সবই হয়েছে প্রফুল্লদার কৃপায়। হবে না? ওর বোন বর্ণিতা নাকি দিনরাত সেঁটে থাকে প্রফুল্লদার গায়ের সাথে।

সমিত মাথা ঠাণ্ডা রাখতে না পেরে বলে ওঠে - 'আমাকে আর পার্টির কাজ দেখিও না স্বপনদা। বোনকে কত করে বললাম প্রফুল্লদার গায়ে সেঁটে যা বর্ণিতার মতো। শুনল না। শুনলে তোমার মত আমারও চিন্তা থাকতো না।'

- 'চুপ কর হারামির বাচ্চা। আর একটা খারাপ কথা বলেছিস তো দেখবি কি অবস্থা করি।' স্বপন তেড়ে এল সমিতের দিকে।

- 'কি করবে তুমি? অ্যাঁ, কি করবে? শালা প্রফুল্লদার দালাল।' সমিত বুকে জমে থাকা রাগটা উগড়ে দিলো পার্টি অফিসে সকলের সামনে। স্বপন চোখ লাল করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বেড়িয়ে গেল পার্টি অফিস থেকে।

পরদিন সকালে সবাই দেখল সমিত মরে পড়ে আছে ওদেরই বাড়ির সামনে। কে যেন খুব কাছ থেকে গুলি করেছে ওকে। ও তাকিয়ে আছে বিস্ফোরিত নয়নে।

যেন শেষবারের মত দেখে নিচ্ছে এই নির্মম সমাজটাকে।

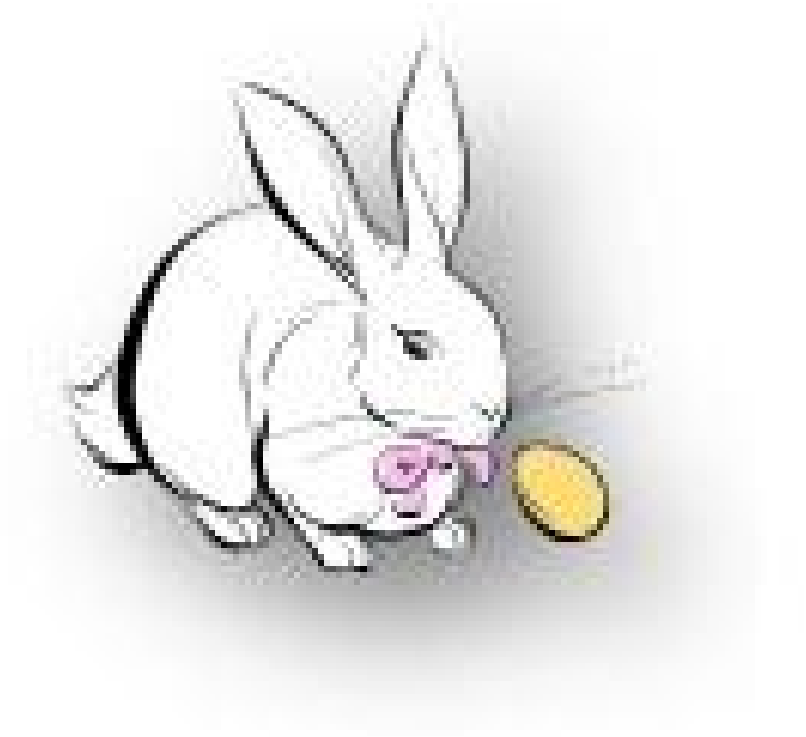

সাবমেরিন ক্যাবল

- নিলেশ্বর দাস, বামুটিয়া, ত্রিপুরা, ভারত।

সাবমেরিন ক্যাবলের অপর নাম সী বেড ক্যাবল। এটি একটি সুপার ফাস্ট হাইওয়ে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ এই সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত আছে। সমুদ্রই হোক বা মহাসমুদ্র, পৃথিবীতে এমন কোন মহাসাগর বাদ যায়নি যার তলদেশ দিয়ে সাবমেরিন ক্যাবল যায়নি। এই ক্যাবলগুলি প্রতিটি মহাদেশকে একে অপরের সাথে জুড়ে দিয়েছে।

বর্তমানে প্রায় ১৯৬ টি দেশ এই ক্যাবলের সাথে যুক্ত।

এই ক্যাবল স্থলভাগে এসে জালের মত ছড়িয়ে পড়েছে দেশে দেশে। প্রতিটি মোবাইল টাওয়ারই হোক কিংবা বা অন্য ইন্টারনেট পরিসেবা, সব কিছুই এই সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে জুড়ে আছে।

পৃথিবীর ৯৯% ইন্টারনেট যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে। উপগ্রহের মাধ্যমেও ইন্টারনেট যোগাযোগ সম্ভব, তবে তা তথ্য আদান প্রদানের দ্রুততায় সাবমেরিন ক্যাবল থেকে অনেক অনেক গুন পিছিয়ে।

অনেকের মত আমিও ভাবতাম ও অপরের সাথে তর্ক করতাম যে, কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমেই ইন্টারনেট যোগাযোগ হয়। পড়াশুনা করে জানলাম সমস্ত রকমের ইন্টারনেট যোগাযোগই হয় সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে। ভয়েস কল, ভিডিও কল, ই-মেল, ফেসবুক, টুইটার সব কিছুই এই সাবমেরিন ক্যাবলের উপর নির্ভর।

মোবাইল হাতে নিয়ে কেউ দিল্লী থেকে ফোন করল অস্ট্রেলিয়ায়। চোখের পলকে সিগন্যাল সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে পৌঁছে যাবে অস্ট্রেলিয়ায়। অথবা কেউ কোলকাতায় বসে ফেসবুকে একটা ক্লিক করল। সেই সিগন্যাল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে, হাজার হাজার মাইল ঘুরে আবার চলে আসবে কোলকাতায়। সব কিছুই এই সাবমেরিন ক্যাবলের বদান্যতায়।

এই সাবমেরিন ক্যাবল সম্ভব হল যে টেকনোলোজির জন্য সেটির নাম ফাইবার অপটিক্স। নাম থেকেই বুঝা যায় ফাইবারের মধ্য দিয়ে আলো চলাচলের টেকনোলোজি। কথাটা বলতে যত সোজা কাজটা ততই কঠিন।

বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় ২৬০টির উপর এই সাবমেরিন ক্যাবল পোঁতা হয়েছে। আরো বহু ক্যাবল পোঁতা হচ্ছে। এই সাবমেরিন ক্যাবলের গড় আয়ু ২০-২৫ বছর। কিন্তু দিন দিন ইন্টারনেট চাহিদা বেড়ে চলছে। ফলে বহু ধনকুবের কোম্পানি এই ব্যবসায় নেমে পড়েছেন।

এই সাবমেরিন ক্যাবলের ও একটি ইতিহাস আছে। যদিও বর্তমান বিশ্ব সাবমেরিন ক্যাবল জালে আবদ্ধ তবে এই সাবমেরিন ক্যাবলের ধারনা এবং প্রয়োগ অনেক পুরানো। আজ থেকে প্রায় ১৬৫ বছর আগে, ১৮৫৩ সালে কপার নির্মিত সাবমেরিন ক্যাবলের দ্বারা যুক্ত হয়েছিল ব্রিটেন সহ ইউরোপের বহু দেশ।

১৮৭০ সালে সেই কপার নির্মিত ক্যাবল ইংল্যান্ড হয়ে ভারতের মুম্বাই এসে পৌছায়। এর প্রায় ১১০ বছর পরে এক যুগান্তরকারী আবিষ্কার হল ফাইবার-অপটিক্যাল ক্যাবল। এই টেকনোলোজি আবিষ্কারের পরেই পৃথিবীতে যোগাযোগ ব্যবস্থার ধরন দ্রুত পাল্টাতে থাকে এবং পালটে ও যায়।

২০০৮ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড। বাংলাদেশের সাবমেরিন ক্যাবলের ল্যান্ডিং স্টেশন কক্সবাজারে স্থাপিত হয়েছে। কক্সবাজার হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত।

বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সাবমেরিন ক্যাবলটির নাম SEA-ME-WE-4. এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯,০০০ কিমি। এটি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১.৪ TB তথ্য আদান প্রদান করে। এশিয়া, আফ্রিকা ও আরব দেশগুলির প্রায় ১৫টি দেশ এই ক্যাবলের সাথে যুক্ত। এই ক্যাবলের এক প্রান্ত ফ্রান্সে এবং অন্য প্রান্ত সিঙ্গাপুরে।

মাটির উপরের জীবনকে গতি প্রদান করতে, সাগর জলের নীচে এত কারসাজী চলছে ভাবলে খুবই অবাক লাগে।

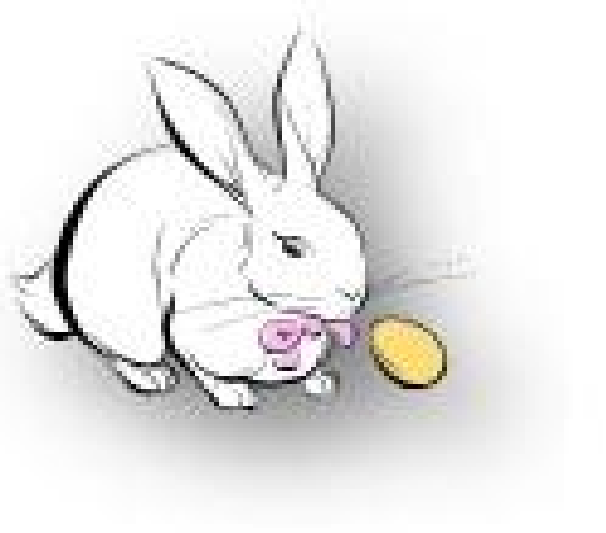

কবিতা

পুজো নয় বন্ধুতা তোমাকে

- পল্লব সেনগুপ্ত

পুজো নয় বন্ধুতা তোমাকে
এই পানি ঢেলে দিচ্ছি রস করে শুষে নাও বুকে
মানছি ঢের করছ তুমি?

এই যে আগাছা সাফ করে দিচ্ছি
কথা দিচ্ছি কাউকে ত্রিসীমায় ঘেঁসতে
দেবনা, কাটবে তো দূরে থাক।

আমি জানি ছায়া ফুল ফলে ভরে দিচ্ছ তুমি
শ্বাস হয়ে বুকে আছ
ঠিক আছে আমি ও সবুজে আজ থেকে বন্ধুতা কেমন?
আমরা ভাই ভাই।

আগুন ছোঁবে না
এই আমি ঘিরে রাখলাম বাহুতে আমার তুমি জড়িয়ে রেখো তোমার ছায়ায়
আমার বিশ্বাস যেন ছুঁতে পারে বিশাল তোমায়
ভালবাসা বিশ্বাস এসব কথা নয় মুখে
সত্যি যেন ভালবাসি
পাশাপাশি যেভাবে থাকি না কেন থাকি যেন সুখেদুখে,
বৃক্ষ, বন্ধুতা তোমাকে, পুজো নয় প্রেম দেব
ভালবেসে।

অবশেষে পাওয়া গেল

- পল্লব সেনগুপ্ত

খুব ঘেঁটে অবশেষে একটা পাওয়া গেল,

দৈর্ঘ্য প্রস্থে যাই হোক,

তা অন্বেষণে আপাতত কেটে যাবে কিছুটা সময়,

গল্পের লহরি তুলে বেশ একটু ধার ধার দিন যাবে আজ,

আমাদের হাতের আঙুল কিছুতেই হাতে থাকছে না আর,

নিজেরই মুদ্রা দোষে কেবলি ঢুকে যাচ্ছে অন্যের পশ্চাতে,

আহা সুখ!

এইখানে হাজার গন্ধের বন,

এইখানে রূপ রস গল্পের মজা,

এইখানে জমে উঠে মরা গরুর পাশে শকুন উল্লাস,

ভুলেও নিজের পুচ্ছটি দেখে না নাড়িয়ে,

ভেবেও দেখে না,

অন্যের পশ্চাতে ঢুকতে নিজের আঙুলই যায় বৃন্দাবনে, তবু যাওয়া চাই।

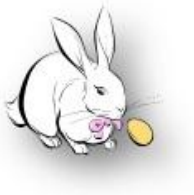

একটু হাসি-

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প

মোল্লা নাসিরুদ্দিন ছিলেন বীরবল, গোপাল ভাঁড়ের মতই একজন চালাক, রসিক, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, প্রতিভাবান মানুষ।

একবার উনাকে জব্দ করতে নবাব কৌশল করে কিছু গ্রামবাসীকে উনার কাছে পাঠালেন। গ্রামবাসীরা নাসিরুদ্দিনের কাছে গিয়ে বলল- 'মোল্লা সাহেব, আমরা গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা কথা নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে। কথাটি হল, মানুষের ভবিষ্যৎ জানতে হলে কি করতে হয়? এই কথাটি নিয়েই ঝগড়া হচ্ছে।

কেউ বলছে, পৃথিবীর কেউই মানুষের ভবিষ্যৎ জানতে পারে না। আবার কেউ বলছে, শুধু মোল্লা নাসিরুদ্দিনই মানুষের সঠিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে পারে। এই সমস্যার সমাধান করেতে আমরা একটি সভার আয়োজন করেছি। আপনাকে ঐ সভায় গিয়ে সমস্যাটির সমাধান করে দিতে হবে। আমরা এ সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু জ্ঞান পেতে চাই।'

চালাক নাসিরুদ্দিন তড়িৎ বুঝে গেলেন যে উনাকে জব্দ করার খুব পরিকল্পনা করা হয়েছে। তিনি বললেন - 'তা বেশ তো , আমি সেই সভাতে যাব আর আপনাদের সে সম্পর্কে জ্ঞান দিয়ে আসবো। এ তো আমার কাছে বেশ সুন্দর এবং গর্বের কথা।'

গ্রামবাসীরা সভার দিন-ক্ষণ বলে বিদায় নিলো। নাসিরুদ্দিন ও তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেললেন তিনি কি করবেন।

যথা সময়ে সভা বসল, প্রচুর লোক নাসিরুদ্দিনকে জব্দ করার তামাশা দেখতে এলো। নাসিরুদ্দিন সভায় গেলেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তৃতা শুরু করলেন।

তিনি বললেন - 'আমি যে ব্যাপারে কথা বলব, সেটা সম্পর্কে কি আপনারা সব জানেন?'

সবাই বলল - 'হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি। আমরা জানি।'

- 'বাঃ বাঃ চমৎকার। আপনারা যখন ঐ ব্যাপারে সব জানেনই, তখন আমি শুধু শুধু আমার আর আপনাদের সময় কেন নষ্ট করব? আমি চললাম।'

সবাই থ খেয়ে গেল। কি হল, কি করবে কেউ ভেবে পেল না। নাসিরুদ্দিন চলে গেলেন।

কিছুদিন পরে আবার গ্রামবাসীরা একই সমস্যা নিয়ে নাসিরুদ্দিনের কাছে গেল। নাসিরুদ্দিন বললেন - 'ঠিক আছে আমি সভাতে যাব।'

যথা সময়ে সভাতে নাসিরুদ্দিন আবার গেলেন আর একই কথা বললেন - 'আমি যে ব্যাপারে কথা বলব, সেটা সম্পর্কে কি আপনারা সব জানেন?'

পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে গ্রামবাসীরা সবাই একসাথে বলল - 'না, না, আমরা কিছুই জানি না।'

এই কথা শুনা মাত্রই নাসিরুদ্দিন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন -'দূর দূর, ছিঃ ছিঃ। আপনারা যদি কিছুই না জানেন তবে আমাকে কেন ডেকে আনলেন? ছিঃ ছিঃ। আগে কিছু জেনে নিন তবে আমাকে ডাকবেন। আমি চললাম।'

আবার সবাই থ খেয়ে গেল। কি হল, কি করবে কেউ ভেবে পেল না। নাসিরুদ্দিন চলে গেলেন।

আবার কিছুদিন পরে সেই গ্রামবাসীরা ঐ সমস্যাটিরই সমাধানের জন্য নাসিরুদ্দিনের কাছে গেল। নাসিরুদ্দিন বললেন - 'ঠিক আছে আমি সভাতে যাব।'

যথা সময়ে সভাতে নাসিরুদ্দিন গেলেন আর একই কথা বললেন - 'আমি যে ব্যাপারে কথা বলব, সেটা সম্পর্কে কি আপনারা সব জানেন?'

পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে এবার অর্ধেক গ্রামবাসী বলল- 'হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি। আমরা জানি।'

আর অর্ধেক গ্রামবাসীরা বলল - 'না না আমরা কিছুই জানি না।'

গ্রামবাসীরা ভাবল এবার নাসিরুদ্দিনকে জব্দ করা গেছে। কিন্তু নাসিরুদ্দিন হাসতে হাসতে বললেন -'বাঃ বাঃ, চমৎকার। যারা কিছুই জানেন না তারা দয়া করে, যারা জানেন, তাদের কাছ থেকে জেনে নিন। আমি তো ব্যস্ত মানুষ। সময়টা নষ্ট করতে চাইনা। আমি চললাম।'

সবাই থ খেয়ে গেল। কি হল, কি করবে কেউ ভেবে পেল না। নাসিরুদ্দিন চলে গেলেন।

গ্রামবাসীরা নিজেরাই নিজেদের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

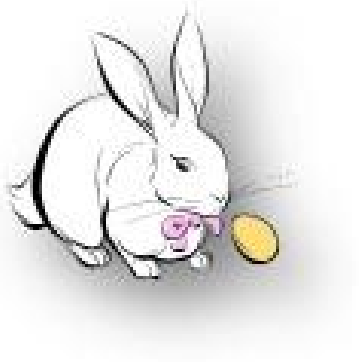

কবিতা

মেঘ

- অমরেশ দেবনাথ, ধলেশ্বর, ত্রিপুরা, ভারত।

কতদিনের জমানো কথা ঝরবে তবে চোখের জলে তোমার চোখেতে চেয়ে,
তুমি নীরবেতে দাঁড়িয়ে শুনো ঐ শ্রাবণের বেদন-গাথা হৃদয়ে-কুঞ্জে,
পাবে আমায় সেই ধারাতে, আকুল হয়ে খুঁজছি তীর তোমার পারেতে,
ভাঙছে যে কেবলই পার, বারেবারে কোন জোয়ারে নীরব গোপন আঘাতে,
তবু আমি বাতাস হয়ে আসি উড়ে বলাকাতে, সিক্ত মেঘের বাদল বয়ে,
ঝরি তোমার কানের প'রে, ঝন্ ঝন্ ঐ নূপুর পায়ে গোপন প্রেমের ইশারাতে,
তুমি দাঁড়িয়ে কেমন পাথর হয়ে, যেন জপছ মালা আমারই পথে; অভিনয়ে,
বুক যে আমার ভরে উঠে হারানো সেই কাননে দুলে, মনের খেয়ালে ঘুরে,
তুমি একটিবার তাকিয়ে দেখো নিশিরাতের তারাটিরে চোখ যে খুলে,
জ্বলছে এখনো কার আশাতে, মিটিমিটি রিক্ত প্রাণে, তোমারই প্রকাশ পেতে,
তুমি ছুঁইয়ে দিও সেই তারাটি, তোমার অসীম প্রেমের জীবন কাঠি দিয়ে,
তবেই তো ফিরে আসবে প্রাণ, রুদ্রাণীতে প্রবল জোয়ারে সিন্ধুসম স্রোতে।
কতকাল ঝড়েনি এমন বাদল তবে, হৃদয় ভেদে মর্মরেতে ব্যকুল চিত্তে,
যখন এসেছে তোমার বাদল, আমার হৃদয়ে পথ যে ভুলে প্রেমের মেঘদূতে,
আমি ব্যকুল নদী স্রোতহীনা, চাই তোমারে বৈশাখীতে; পুণ্য স্নানে,
বারে বারে ফিরে ফিরে জমানো যত বধির মেঘের নীরব বর্ষণেতে।
তুমিই তো জীবনের শেষ প্রদীপ, গহন আধারে তমস বিজনে অন্ধকার পথে,
তোমারই শিখায় আসবে জ্যোতি, অন্ধ চোখেতে আলো নিয়ে অরুণোদয়ে,
আমার যাবার সময় হলে, জ্বালবে তুমি শেষ শিখাটি পুণ্য হোমে, পূজার আসনে,
তখন যেন হও পূজারী হও দিশারী, তোমার ছোঁয়ায় পূর্ণ করে বিদায় নিরঞ্জনে,
আবার আসব গোপন কোন মেঘের দোলায় ফিরে ফিরে আনন্দেতে রবে নীরবে,
ঢেউ তুলে যে তোমার পালে, তোমায় ভাসিয়ে আমার দেশের বলাকাতে।।

কবিতা

- অমরেশ দেবনাথ

নীরব রাতের গোপন দহনে লিখছি গীতি তোমারই লিপির সুর ধারাতে,
তবু কেমন ভোরের আলো যায় যে ছুঁইয়ে বন্ধ চোখের মৃত প্রাণে জীবনী-সুধাতে,
তুমি লুকিয়ে আছ ভিতরে বাহিরে, বেদন ভাবে; সৃষ্টি সুখের চরম আনন্দে,
বারেবারে পাই তোমারে নিবিড় কোন পরশেতে, দহন শিখায় প্রদীপ জ্বেলে,
সেই আগুনের পুণ্য হোমে আসে প্রেম নিবিড় ধারায় বৈশাখীর মাতাল সমীরে,
কত ডাল যায় যে ভেঙে গোপন সেই ঝড়ের রোষে, প্রলয় এনে হৃদয়কুঞ্জে লহরীতে,
তবুও আমি দাঁড়িয়ে আছি বিজন পথে নিশীথ রাতে, তোমারই প্রেমের অনুদানে,
তোমায় পেতে বজ্রাঘাতে, নিঠুর আঘাতের দাবানলে, শুকনো দহিত শাঁখে।
জীবন নদী বয়েছিল দিক হারিয়ে কূল ছাপিয়ে, মত্ত মাতালের তিক্ত প্রমাদে,
গভীর কোন কালো অরণ্যে নিজেরে দিয়েছি বিকে তবে, রিক্ত হয়ে চণ্ডালেতে,
সেই চিতাতে তুমিই জ্বেলেছ প্রেমের শিখা হোমানলে, পূজার ফুলেতে,
সেই ফুলেরই মালা বুনে দিয়েছ আমার বক্ষ মাঝে, নবজনমে নতুন দিশাতে।
আমিই আবার পথ ভুলেছি নিজ গুনে তোমায় ভুলে, কঠিন পাথরে বীজ রোপণে,
তখনই এসেছে ঝড় যে ধেয়ে সকল শাখা ভেঙে; সবুজ কেড়ে ধূসর আবিরে,
যত বীজ করেছি রোপণ বন্ধ্যা ঐ রিক্ত রূপে, এনেছে আঘাত মায়ার ছলে,
কোন সে ঝড়ের প্রবল মেঘে, ভেঙে দিল ভিতর বাহির শূন্য করে হাহাকারে,
সেই প্রলয়ে ফিরে ফিরে এসো তুমি কবিতা হয়ে, চরম কালোর নির্মোচনে,
তাইতো তুমি গাও হে ভ্রমর গুনগুনিয়ে নিমন্ত্রণে, ভোরেরই রবির কিরণে,
হে কবিতা, কি দিয়েছ জীবন ধরে, তোমার রঙে ভরিয়ে তবে প্রকাশেতে,
সেই ধারারই বিমল প্রবাহে ধূলা আমার যায় যে ঝরে, অসীম অনুদানে।

কুইজ

- সাবিত্রী সরকার, ত্রিপুরা, ভারত।

১. টেলিফোন সেবায় কবে প্রথম ফাইবার অপটিক্স ক্যাবলের ব্যাবহার শুরু হয়?

উঃ - ১৯৭৫ সালে।

২. সমতল অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের চেয়ে, পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের শরীরে রক্ত বেশী থাকে না কম থাকে?

উঃ- প্রায় ২ লিটার বেশী থাকে।

৩. পরিশ্রম করার সময় মানুষের শরীরে তাৎক্ষণিক ভাবে শক্তির জোগান দেয় কোন অঙ্গ?

উঃ- লিভার। লিভারের মধ্যে গ্লাইকোজেন সঞ্চিত থাকে। পরিশ্রম করার সময় এই গ্লাইকোজেন গ্লুকোজে পরিণত হয়ে প্রয়োজনীয় শক্তির জোগান দেয়।

৪. লেজার কোন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন?

উঃ- T. H. Syaman.

৫. কত সালে রক্তচাপ মাপার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়?

উঃ- ১৮৯৬ সালে।

৬. পঞ্চ পাহাড়ের দেশ কাকে বলা হয়?

উঃ- ত্রিপুরাকে পঞ্চ পাহাড়ের দেশ বলা হয়।

৭. হিমালয়ের রানী কাকে বলা হয়?

উঃ- মসৌরীকে হিমালয়ের রানী বলা হয়।

৮. চাঁদের তাপমাত্রা দিনে কত আর রাতে কত থাকে?

উঃ- দিনে প্রায় ১৮০ ডিগ্রী, রাতে প্রায় ১০০ ডিগ্রী।

৯. জলের তলাতে কোন যন্ত্র দিয়ে শব্দ পরিমাপ করা হয়?

উঃ- হাইড্রোফোন।

১০. বিশ্বের কোন শহর দুটি মহাদেশের মধ্যে অবস্থিত?

উঃ- ইস্তাম্বুল।

১১. পৃথিবীর সবচেয়ে খরস্রোতা নদী কোনটি?

উঃ- রাইন নদী হল পৃথিবীর সবচেয়ে খরস্রোতা নদী।

১২. কোন প্রাণী কত বছর পর্যন্ত না পাওয়া গেল তাকে বিলুপ্ত হিসাবে ধরা হয়?

উঃ- ৫০ বছর।

১৩. ' ডং ' কোন দেশের মুদ্রার নাম?

উঃ- ভিয়েতনাম।

১৪. ' পিয়ানোর দেশ' কোনটিকে বলা হয়?

উঃ- চীনকে পিয়ানোর দেশ বলা হয়।

১৫. প্লেগ রোগের জীবাণুকে কে আবিষ্কার করেন এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখেন?

উঃ- অ্যাথানসিয়াস কিরচে, ১৬৫৮ সালে।

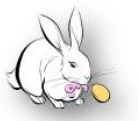

কবিতা

কৃষ্ণচূড়া রূপ তোমার

-মোঃ মাছুম ভূইয়া, Malayasia.

নীলাম্বরী তুমি যে আমার চোখে-
হরিণী বিহারিণী বনফুল।
এক নজর দেখলে পথিক -
পথ চিনতে করিবে ভুল।

নীলাম্বরী তোমাকে দেখে মনের গিটারে-
ভালোবাসার সুর বাজে।
উথাল পাতাল করে হৃদয়-
গোধূলির রঙে মন সাজে।

নীলাম্বরী তোমার ঐ-
কৃষ্ণচূড়া রূপের জ্যোৎস্নায়
এক ফালি চাঁদ হাসে মনের আঙ্গিনায়।
মরিতে চাই ডুবে আমি-
ওগো মরিতে চাই ডুবে,
তোমার ঐ কৃষ্ণচূড়া রূপ যমুনায়।

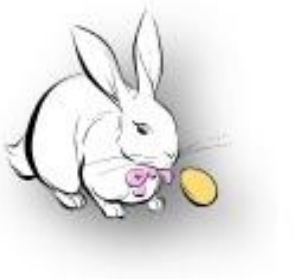

চুটকি হাসি

- হরপ্রসাদ সরকার।

হেডমাষ্টারবাবু এক ছাত্রকে ডেকে এনে খুব কষে ধমক দিলেন।

- 'বল, তুমি কি করে ছিলে? অংকের দিদিমণি কেন অজ্ঞান হয়ে গেলেন?'
ছাত্র কাঁদো কাঁদো সুরে বলল -' স্যার আমি শুধু দাঁড়িয়ে দিদিমণিকে বলেছিলাম, আমি সবগুলি হোম-ওয়ার্ক করে এনেছি!!'

শিক্ষক ছাত্রকে জিজ্ঞাস করলেন - ' বলতো, শিবু Head কে আমরা কি নামে চিনি?' ছাত্রটি এতই ঘাবড়ে গিয়েছিল যে তার মনে ' মাথা বা মস্তক' শব্দগুলি আসছিল না। উত্তর না দিলে আবার স্যার দুই ঘা লাগিয়ে দেবেন।
তাই সে উত্তর দিল - 'স্যার, Head শব্দটির অর্থ হল কেল্লা।'

শিক্ষক ছাত্রকে - 'বলতো পবন, পবন কে?'

পবন আশ্চর্য হয়ে বলল - 'স্যার আমিই তো পবন। শ্রীপবনপুকুরি লোন্দা।'

একক ক্লাসের শিক্ষকের মত এক ছাত্রও কানে কম শুনতে পেত। তাদের কথোপকথন।

শিক্ষক -'পলাশ তোমার বাড়ি কোথায়?'

ছাত্র শুনল - পলাশ তোমার বিড়ি কোথায়?

ছাত্র ঘাবড়ে গেল। সে থতমত খেয়ে বলল - 'রান্নাঘরে।'

- 'রাধানগরে!! বাঃ বাঃ বেশ বেশ। আমার বাড়িও রাধানগরে।'

ছাত্র শুনল - রান্নাঘরে!! বাঃ বাঃ বেশ বেশ। আমার বিড়িও রান্নাঘরে।'

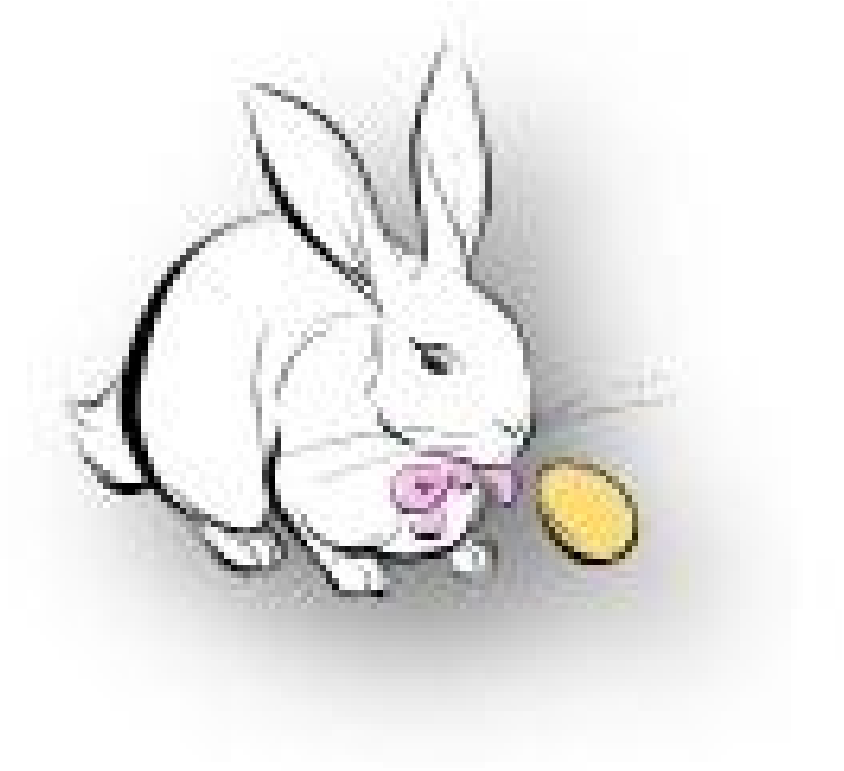

কবিতা

কোন দেশের পরি তুমি

- হরপ্রসাদ সরকার

কোন দেশের পরী তুমি
কোথায় তোমার দেশ?
রূপের প্রদীপ হয়েও এটা
কেমন তোমার বেশ?

ঝড়ে গেল ফুল
তোমার ছোঁয়ায় -
উড়ে গেল প্রজাপতি
তোমার কথায়!
একি তোমার ছলনা, নাকি প্রেমের মোহক আবেশ?

দিলনা সাড়া মৃদু হাওয়া
শুধু তব সৌরভ নিয়ে গেল -
এলো চুলে গহীন মালা
এলো খেলো লাগিয়ে গেল!
সেকি চিনেনি তোমায়, নাকি বিশ্বাস করেনি বিশেষ?

কবিতা

তোমার মনে

- হরপ্রসাদ সরকার

যেন ফোটে মোর জীবন কলি
নিঝুম ভোরে হাওয়ার দোলায়-
যেন ঝড়ে প্রাণ তোমার কোলে
গন্ধ ছড়ায়ে সাঁঝের বেলায়।

মোর ভালবাসা রয় যেন
জীবন ভর তোমার স্মরণে
যেন থাকে মোর একটি হাসি
নিশিদিন তোমার মনে।

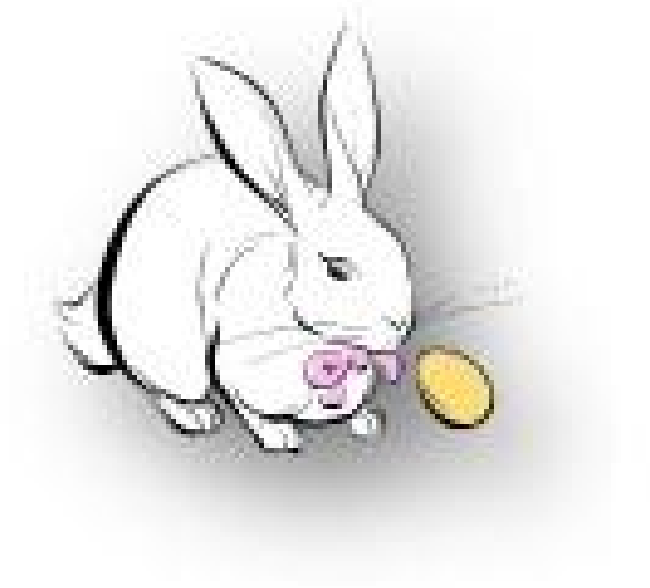

গল্প-

খারাপ সময়

- হরপ্রসাদ সরকার

এই কিছুদিন আগের একটি সত্য ঘটনা। আমার তিন শিক্ষিত বন্ধু সাগর, বিশাল আর মিঠু নিজ নিজ ব্যবসায় খুব লোকসানে পড়ল। খুব লোকসান বলতে খুব লোকসান। জমা পুঁজি, ঘরের সোনাদানা সব তো শেষ হলই, সাথে ব্যবসাও বন্ধ হয়ে গেল। তারা যে কাজেই যায়, সেই কাজেই ক্ষতি আর ক্ষতি। এক টাকা লাভ হলে, দশ টাকা লোকসান। তারা ভেবেই পাচ্ছিল না, কি করবে না কি করবে। অগত্যা তিন যুবক-বন্ধুই ঘরে বসে গেল। খুব খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে তারা জীবন অতিবাহিত করতে লাগল। সবারই বৌ-বাচ্চা আছে ফলে পরিস্থিতি খুব খারাপ দাঁড়াল।

ঘরে বসার কিছুদিনের মধ্যেই তিন বন্ধু তিন রকমের কাজ করতে লাগল।

বিশালঃ- এই খারাপ সময়টাকে সে কিভাবে কাজে লাগবে তাইই ভাবতে লাগল। এই খারাপ সময়টা যেন বৃথা না যায়, এই ভেবে সে বহু কষ্ট করে একটা কম্পিউটার কিনে আনল। আর দিন-রাত, নিষ্ঠার সাথে খুব পরিশ্রম করে, কম্পিউটার নিয়ে পড়াশুনা করতে লাগল। এক পা, এক পা করে এগোতে এগোতে সে কিছুদিনের মধ্যেই কম্পিউটারর সাগরে গিয়ে পড়ল। সে আর কম্পিউটার ছাড়ল না- কম্পিউটার ও তাকে ছাড়ল না। সে দ্রুত বেগে তার ভাল সময়ের দিকে দৌড়াতে লাগল, আর ভাল সময়টাকে আপ্রাণে পরিশ্রম করে নিজের দিকে টানতে লাগল।

মিঠুঃ- সে কিছুদিন হতাশ হয়ে ঘুরাঘুরি করে শেষে বিশালকে দেখে, বিশালেরই অনুকরণ করতে লাগল। তবে অন্য ভাবে। কম্পিউটারে তার মাথা ছিল না। সে একটা হাতের কাজ শিখতে শুরু করল। সে সেলাই মেশিন কিনে এনে সেলাই শিখতে লাগল। ছয় মাসেই সে নিজেকে সঠিক কাবিল বানিয়ে ফেলল। আর তার টুকটাক রোজগার ও শুরু হয়ে গেল।

সাগরঃ- সে সারাদিন ঠাকুর ঠাকুর করে ঠাকুর ঘরেই পরে থাকল। *TV* তে খেলা দেখে, খবর দেখে, দুই তিনটা পত্রিকা পড়ে, ম্যাগাজিন পড়ে সময় কাটাতে লাগল। সে আবার ব্যবসা শুরু করতে ভাল সময়ের অপেক্ষা করতে থাকল।

আজ প্রায় দুই বছর পরে, বিশাল এক বিরাট কম্পিউটারের ব্যবসার মালিক। তার দিন দুনি তো রাত চৌগুণ ব্যবসা বেড়ে চলছে। গাড়ি, বাড়ি সব লাইন ধরে তার দিকে আসতে লাগল।

মিঠু ভাল দর্জির কাজ শুরু করল। কিছু টাকা জমতেই সে তার পুরানো ব্যবসা ও শুরু করল। এখন সে এক সাথে দুটি ব্যবসা চালাচ্ছে। সে চার পাঁচ জন কর্মচারীও রেখেছে।

আর সাগর*?*

তার ভাল সময় আজো এলো না। আজো সে বাড়িতে বসে *TV* দেখে, পত্রিকা পড়ে। ঘরে খুব অশান্তি। আর এই অশান্তির কারণে সে ঠাকুরের উপরে বিশ্বাস ও হারিয়েছে। আজ সে আর ঠাকুর ঘরে যায় না। তবে ব্যবসা শুরু করতে ভাল সময়ের অপেক্ষা ঠিকই করছে।

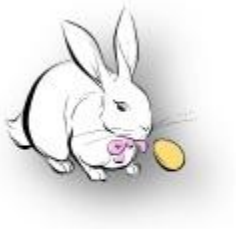

গল্প-

বুড়ি ভিখারি

- হরপ্রসাদ সরকার

সেই সময়ে সেই রাজার দেশে, এক পাহাড়ের পাদদেশে, এক গ্রামে এক গরিব বিধবা মা ও তার মেয়ে থাকত। তাদের ভাঙ্গা ঘরের চাল দিয়ে আকাশের তারা সুন্দর দেখা যেত। মা লোকের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে এক আনা- দুই আনা রোজগার করত। তার রূপসী যুবতী মেয়ে ঘরে বসে গ্রামবাসীদের জামাকাপড় সিলাই করে এক আনা- দুই আনা পেত। কোন ভাবে খুব কষ্টের মধ্য দিয়ে তাদের সংসার চলছিল। তাদের না ছিল ভাল ঘর, না ছিল ভাল কাপড়। না ছিল ভাল থাকার জায়গা, না ছিল দামী গয়না, না ছিল ভাল খাবারের জোগাড়। তবে তাদের মন ছিল সোনার। তাই গ্রামের সবাই তাদের স্নেহ করত। আর কনক দেখতেও ছিল কনকের মতই সুন্দরী, সুশ্রী, নম্র, ভদ্র।

কিন্তু কনক তাদের অবস্থা এমন ছিল না। তারাও এক সময় ভাল অবস্থায় ছিল। কনকের বাবার ভাল ব্যবসাও ছিল। কিন্তু কনকের কাকা তার বাবাকে খুব ঠকিয়ে সব টাকা পয়সা নিজের করে নেয়। এই দুঃখে দুঃখে কনকের বাবা মারা গেল। আজ কনক দুবেলা খেতে পায়না, কিন্তু তার কাকা, কাকী আর কাকাতো বোন, হেমা প্রতিদিন মাছ-মাংস আর দশ-পনের তরকারি দিয়ে ভাত খায়। যতটুকু খায় তার থেকে বেশী লোকসান করে। কাউকে কিছুই দিতে চায়না। কেউ কিছু চাইতে এলে হৈ -হৈ করে আসে আর গালি-গালোজ শুরু করে দেয়। কনক আর তার মাকে, কনকের কাকা, কাকী আর হেমা দু চোখে দেখতে পারেনা। সব সময় ঝগড়া করতে মুখিয়ে থাকে, সারা গায়ে কনকের দুর্নাম গেয়ে বেড়ায়।

হেমা আর কনক সমবয়সী। দুজনই সুন্দর। তবু লোকে কনককে খুব ভালবাসে, এটা হেমা আর তার মা, বাবার সহ্য হয় না। তাই তারা সব সময়ই কনকের ক্ষতির চিন্তা করে। ফলে কনক আর তার মা সব সময়ই তাদের থেকে দুরেই থাকে।

এমনি করে দিন যাচ্ছিল। একদিন এক খুরখুরে বুড়ি ভিখারি, কাকার বাড়িতে গিয়ে উঠল, ভিক্ষা চাইল। কেউ ভিক্ষা দিতে বের হল না। বুড়ি কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করল। তখন হেমা এক মুঠ চাল এনে বুড়ির গায়ে ছুড়ে দিয়ে, কষে দুটি গালি দিয়ে হন হন করে ঘরে চলে গেল। বুড়িটি হি হি করে কিছুক্ষণ হেসে চলে গেল।

সে গিয়ে উঠল কনকের বাড়িতে। ভিক্ষা চাইল। গত দুই দিন ঘরে খাওয়ার কিছুই ছিল না। কনকের মার খুব জ্বর, তাই তিনি ঝিয়ের কাজ করতে পারেনি। ফলে রোজগার ও হয়নি, ঘরে চাল ও আসেনি। সেলাইয়ের কাজ মাস খানেক কিছুই হচ্ছে না। তাই ঘরে একটি দানাও ছিল না।

ভিখারির ডাকে কনক খালি হাতেই ঘর থেকে বের হয়ে এল। লজ্জায়-অপমানে তার চোখ ছল ছল করছিল। তার মুখ থেকে কোন কথাই সরছিল না। সে মাথা নিচু করে অতি কষ্ট বলল – ‘ আজ যে ঘরে কিছুই নেই। তোমাকে কি দেব। ’

তার এই কথাতেই ভিখারির মন গলে গেল। কনকের কথাগুলির মধ্যে যে চরম সততা লুকিয়ে আছে ভিখারির বুঝতে বাকি রইল না। ভিখারিও ছল-ছল চোখে তাকিয়ে রইল কনকের দিকে যেন আরো ভাল করে দেখতে চাইছে কনককে। ভিখারি দেখল কনক একটি ছেঁড়া জামা গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। রুক্ষ চুল। মলিন গালে, চোখের জলের দাগ স্পষ্ট। এত দারিদ্র্যতার মধ্যেও কনকের রূপ যেন, কালো ঘন মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করে পূর্ণিমা চাঁদের আলোর মত বেড়িয়ে আসছে।

ভিখারি অনেকক্ষন চেয়ে রইল কনকের দিকে। তারপর হি হি করে হাসতে লাগল। কনক অবাক হয়ে চোখ তুলে চাইতেই খুরখুরে বুড়ি ভিখারি বলল, ‘ ও কথা বলিস

না রে পাগলি। আজ তো আমি তোর কাছ থেকে ভিক্ষা না নিয়ে যাবই না। এই আমি এখানেই গাছতলাতে বসলাম। তুই ভিক্ষা দিলেই তবে যাব।'

– 'কিন্তু?'

কনককে থামিয়ে বুড়ি বলল – 'আগে আমাকে একটু খাবার জল দে। আগে জল খাব তবে ভিক্ষা নেব।' কনক হাসি মুখে ঘর থেকে খাবার জল নিয়ে এল। বুড়ি হি হি করে হেসে বলল – 'এই জল তো আমি খাব না। তুই কলসি কাঁখে ও পাহাড়ের ঝর্নাতে স্নান করেত যা। স্নান সেরে কলসি ভরে জল নিয়ে আসবি। সেই জল আমি খাব। যা যা, এখুনি আমার কথা মত কাজ কর।'

কনক না করতে পারল না। সে অবাক হয়ে কলসি কাঁখে বেড়িয়ে গেল পাহাড়ের ঐ ঝর্ণার দিকে। এই ঝর্ণাটিকে সবাই চিনে। কনকও বিকালের দিকে প্রায়ই এখানে বেড়াতে আসে। কনক সেই ঝর্ণাতে স্নান করে, এক কলসি জল নিয়ে তাড়াতাড়িই ফিরে এল। বুড়ি ভিখারি তেমনিই বসেছিল। কনক কাছে আসতেই সে জলের গেলাসটা কলসির দিকে বাড়িয়ে দিল – 'দে লো জল দে। খুব তেষ্টা পেয়েছে যে।'

কিন্তু কি অবাক কাণ্ড, কনক ঐ গেলাসে যেই জল ঢালতে গেল অমনি দুটি সোনার টুকরা টুক-টুক করে গেলাসটির মধ্যে পড়ে গেল। ভিখারি লাফিয়ে উঠল– 'কি রে, তুই যে বললি আজ ঘরে কিছুই নাই। তবে এই সোনার টুকরা এল কোথা থেকে? আমার সাথে মিথ্যা বলেছিলি। তুই এই দুটি সোনার টুকরা কলসির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলি?'

কনক খুব অবাক হল। সে বিশ্বাসই করতে পারছিলনা। সে থতমত খেয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

– 'এবার বল, এই সোনার টুকরা গুলির কি করবি?'

- ‘ আমি জানি এগুলি আমার জিনিস নয়। এগুলি যখন তোমার গেলাসে পড়ল তখন, তুমিই এই সোনার টুকরাগুলি নিয়ে যাও। মনে কর তুমি তোমার ভিক্ষা পেয়ে গেছ। ’

কনকের এই কথা শুনে বুড়ি ভিখারির চোখ ছানাভরা হয়ে রইল। সে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল কনকের দিকে। কনক কিছু না বলে ভিজা শরীরে ঘরে চলে গেল। ভিজা জামাকাপড় ছেড়ে, ঘর থেকে বের হয়ে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল। বুড়ি তো এখনো যায়নি, উল্টা সেই গাছের নীচে বসেই রান্না জুড়ে দিয়েছে। আর সে কি রান্নার বহর? যেন রাজভোগের আয়োজন।

বুড়ি কনকের দিয়ে চেয়ে হি-হি করে হেসে বলল – ‘ কই রে পাগলী, বড্ড খিদে পেয়েছিল তো, তাই এখানেই রান্না শুরু করে দিলাম। আমি আবার ছাই কলা দিয়ে খেতে পারিনা। খাবই যখন একটু ভাল করেই খাব। আমি এখানে রান্না করে খেলে তোমার কোন অসুবিধা নেই তো?’

কনক মিষ্টি হাসি হেসে বলল- ‘ না না , কোন অসুবিধা নেই। তুমি তোমার মত করে রান্না করে পেঠ ভরে খাও। ’ এই বলে কনক ঘরে চলে যাচ্ছিল কি বুড়ি আবার ডাক দিল – ‘ও পাগলী, আমাকে একটু সাহায্য করবি না? আমি যে আর একা সামলাতে পারছি না। তার উপর আমার আবার কয়েকটা থালা বাটির ও দরকার পড়েছে। ’

হাসতে হাসতে কনক বলল – দাঁড়াও আসছি।

এমন রান্না শুরু হল যেন স্বর্গের রান্না। মধুর, সুস্বাদু গন্ধে চারিদিক ছেয়ে গেল। হেমা আর তার মা-বাবা উকি দিয়ে দেখতে লাগল, ফকিরের বাড়িতে আবার এমন খাবারের গন্ধ কোথা থেকে এল? সব দেখে শুনে তো তাদের পিত্ত জ্বলতে লাগল।

খুব তাড়াতাড়িই রান্না শেষ হয়ে গেল। রান্না শেষ হতেই বুড়ি বলল – ‘ একা একা খেতে আমার তো ভাল লাগেনা। আর আমি এত কিছু কি একা খেতে পারবো? আয় আয়, মাকে ডাকে নিয়ে আয়। সবাই মিলে একটু আহার করি। ’

কনক ভেবে পাচ্ছিলনা এ সব আজ কি হচ্ছে। সে ধীর পায়ে ঘরে গিয়ে মাকে বাইরে নিয়ে এল। মা বাইরে এসে এত সব খাবার-দাবার দেখে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না, জেগে আছেন কি স্বপ্ন দেখছেন? তিনি একবার কনকের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন তো আরেকবার বুড়িটিকে চিনতে চেষ্টা করছেন।

খুরখুরে বুড়িটি দুই পা এগিয়ে এসে শক্ত হাতে অসুস্থ মাকে ধরে গাছতলাতে নিয়ে গেল। বলল ‘ খাও গো খাও, এ সব তো তোমার মেয়েরই খাবার। পেট ভরে খাও। ’

অনেক যুগ পরে কনক আর তার মা এমন পেট ভরে এত সব খাবার খেল। এ সব দেখে কাকা-কাকীর তো মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। তারা কি-করবে-না-কি-করবে, ভেবে পাচ্ছে না। বুড়ি বলল –কিছু খাবার তো অবশিষ্ট রয়ে গেল, তা তোমরা রাতে পেট ভরে খেয়ে নিও বাপু। আমি চললুম। আজ দিব্যি খাবার হয়েছে। এই বলে বুড়ি তার হাড়ি বাসন তেমনি ফেলে রেখে চলে গেল। ফিরেও তাকাল না। ’

পরদিন আবার সে বুড়ি এসে হাজির। হি-হি করে হাসতে হাসতে গাছের নীচে বসে খাবার জল চাইল। যেমন তেমন জল হলে হবে না। সেই ঝর্ণারই জল চাই। কনক আনন্দে আনন্দে কলসি কাঁখে বুড়ির জন্য ঝর্নার জল আনতে গেল। আজ স্নান সেরে কলসিটিকে সে উল্টে-পাল্টে দেখল তার মধ্যে কিছু আছে কি না। কিছুই ছিল না। তারপর তাতে ঝর্ণার জল ভরার সময়ও লক্ষ্য করল তাতে কিছু পড়ছে কি না। কিছুই পরল না। সে বাড়ি ফিরেই দেখল গতকালের মত বুড়ি আবার রান্না করতে বসেছে। আর রান্নার আয়োজন দেখে মনে হচ্ছে যেন রাজবাড়ির রান্না। ধীর পায়ে

কনক বাড়িতে আসতেই বুড়ি তার গেলাস বাড়িয়ে দিল – ‘ দে লো পাগলী, জল দে, তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে। ’

কনক সেই গেলাসে জল ঢালতে লাগল। অমনি আবার সেই কলসি থেকে দুই তিন টুকরা সোনা সেই গেলাসে টপ টপ করে পরে গেল। বুড়ি হি হি করে হাসতে লাগল। কনকও হতবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এ কেমন করে হল? আজ তো সে ভাল করে পরখ করেই জল ভরেছে।

বুড়ি ফিক-ফিক করে হেসে বলল – ‘ এ গুলির কি করবি লো পাগলি। ’

- ‘এ গুলি তো আর আমার না। তুমিই যখন পেয়েছো তখন তুমিই নিয়ে যাও। ’ হাসতে হাসতে কথাগুলি বলে কনক ঘরে চলে গেল। বুড়ি অবাক হয়ে কনকের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে, কেন যেন হি হি করে হেসে উঠল।

রান্না হয়ে গেল, তিন জনেই পেট ভরে খেল। কিছু খাবার অবশিষ্ট ও রইল। বুড়ি বলল – ‘সে তোমরা রাতে খেয়ে নিও। আমি তো চললুম। ’ বুড়ি চলে গিয়েও আবার ফিরে এল। কনকের কাঁধে হাত রেখে, এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কনকের চোখে রেখে রহস্যময়ী হাসি হেসে বলল – ‘ শোন পাগলি, কাল আমি আসার আগেই তুই স্নান সেরে আমার জন্য জল নিয়ে আসবি। মনে থাকবে তো?’ কনক মাথা নাড়ল। বুড়ি কি-জানি-কি ভেবে গোপন হাসি হাসতে হাসতে চলে গেল।

অন্যদিকে লুকিয়ে লুকিয়ে আজকের সব ঘটনা কনকের কাকা, কাকী আর হেমা খুব দেখল। তাদের পিত্ত দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। সন্ধ্যা হতেই কনকের কাকা বেশ কিছু লাঠিয়াল, ডাকতদের বাড়িতে ডাকল, আর কনক ও তার মাকে আজ রাতেই খতম করে দেবার হুকুম দিল।

গভীর রাতে ডাকাতের দল দা, তলোয়ার, বল্লম নিয়ে হাজির হল কনক ও তার মাকে শেষ করে দিতে। কয়েক জন বাড়িতে ডুকল আর কয়েক জন বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। পঞ্চমীর চাঁদের আবছা আলোতে ডাকাতরা যা দেখতে পেল তা দেখে তাদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। গোটা দশ খুন-খার বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা বাড়িতে। কোথাও পা ফেলার জায়গা নেই। যে ডাকাতগুলি হাতিয়ার নিয়ে ভীতরে গিয়েছিল, তারা কোন ভাবে প্রাণ হাতে নিয়ে প্রাণপণে দৌড়তে দৌড়তে ঝড়ের মত এমন পালিয়ে গেল যে একবারের জন্য ও পিছন ফিরে দেখল না। বাকিরাও যে যার দিকে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। এই খবর শুধু ডাকাতদের ছাড়া আর কেউ জানল না।

পরের দিন ভোরে কাকা, কাকী আর হেমা খুশি মনে ঘুম থেকে উঠল, কিন্তু কনক ও তার মাকে জীবিত দেখে হয়রান। তাদের মাথায় যেন বাজ পড়ল, তাদের পিলে চমকে গেল। ওদের সমনে দিয়েই কনক কলসি কাঁখে জল আনতে চলল ঝর্ণার দিকে। মনে কেন জানি আজ তার খুব আনন্দ, শুধু শুধু মন আজ খুশির জোয়ারে ভাসছে।

সে ঝর্ণাতে গিয়ে আপনমনে স্নান করেতে লাগল। স্নানের শেষ সে কলসিতে জল ভরতে লাগল। কলসিতে জল ভরা হয়েছে কি হঠাৎ তার কলসিটিতে কি যেন এসে লাগল আর টুং করে আওয়াজ হল। সাথে সাথেই কলসিটি ভেঙ্গে দুই খান হয়ে গেল। থতমত খেয়ে উঠল কনক। কিন্তু সে বেশ আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগল তার কলসি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে রঙিন প্রজাপতি উড়ে উড়ে বনের দিকে চলে যাচ্ছে, কিছু দুর গিয়ে আবার তার কাছে ফিরে আসছে। আবার যাচ্ছে আবার আসছে। কনক কিছুই বুঝতে পারল না। সে ভয়ে চুপচাপ বাড়ির দিকে ফিরে এল।

কনক চলে যাবার পর তার কাকা, কাকী আর হেমা একটি গাছের আড়াল থেকে বের হল। তারাই ঢিল মেরে কনকের কলসি ভেঙ্গেছিল। কারণ কনক যেন আজ আর সোনার টুকরা নিয়ে বাড়িতে না যেতে পারে। কনক চলে যেতেই তারা সেই ঝর্ণাতে খুব করে স্নান করল। তারপর সবাই এক এক কলসি জল ভরে বাড়ির দিকে চলল। সোনার টুকরা পাবার লোভে।

ও মা, সে কি!! বাড়ির কাছে আসতেই তাদের মাথা গরম হয়ে গেল। কনকের বাড়ির সামনে সোনার রথ দাঁড়িয়ে আছে। আর তার থেকে সে দেশের রাজপুত্র নেমে আসছে। সেই রথের চারিধারে অনেক গ্রামবাসী, অনেক সিপাহী। দেখতে দেখতে রাজপুত্র কনকের বাড়িতে গেল, মিষ্টি হাসি হেসে কনকের হাত ধরে, তার চোখে চোখ রেখে তাকে রথে তুলে নিলো। সেনাপতি কনকের মাকে নিয়ে ধীরে ধীরে পিছনের অন্য রথটিতে গিয়ে বসলেন। সবার চোখে মুখে মহা-খুশির, মহা-আনন্দের হাসি। শুধু কাকা, কাকীর মুখে হায়, হায়। গড় গড় করে রথ চলতে লাগল। টগবগ, টগবগ করে সিপাহীদের ঘোড়া চলতে লাগল। গ্রামবাসীরা ধন্য ধন্য করে জয় জয়কার করতে লাগল।

এই সব দেখে কনকের কাকা, কাকী আর হেমার গায়ে যেন আগুন লেগে গেল। তার চুল ছিঁড়বে, না মাথা ভাঙ্গবে ভেবেই পাচ্ছে না। এমন সময় তাদের নজর পড়ল জল ভরা তিনটি কলসির উপর। দুঃখের মধ্যেও তাদের মনে একটু সুখের ক্ষীণ হাওয়া লাগল। তাড়াতাড়ি তারা বাড়িতে গিয়ে সোনার লোভে, ভরা কলসিগুলি উলটে দিল। কৈ সোনা , কৈ হীরা। ঝর ঝর সেই কলসি থেকে অনেকগুলি জীবন্ত কালসাপ বেড়িয়ে এসে ফণা তুলে বসল।

দিন পেড়িয়ে গেল। সেই বুড়িকে কোন দিন আর কেউ দেখেনি। তেমনি হেমা আর তার মা-বাবাকেও ঐ দিনের পর আর কেউ আর কোন দিন খুঁজে পায়নি। আর কনক? সে সে দেশের মহারানী হয়ে অতি সুখে জীবন কাটাতে লাগল।

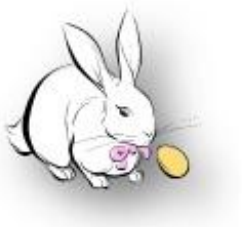

দুই মেঘ

- হরপ্রসাদ সরকার

একদিন কাঠফাটা রোদে দুইটি কুচকুচে কালো মেঘ আকাশ দিয়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছিল। তারা দুই বন্ধু, ওনা আর বনা। তারা উড়ে যেতে যেতে দেখল এক রাজ্যে জলের খুব অকাল পড়েছে। চারিদিকে জলের জন্য হাহাকার। সব পুকুর, নালা শুকিয়ে আছে। গাছপালা সব শুকিয়ে মরার মত দাঁড়িয়ে আছে। কোন গাছেই কোন পাতা নেই, ফল নেই। তপ্ত রোদে মাঠের পর মাঠ ফেটে আছে। মাঠের ফসল সব মরে গেছে, জ্বলে গেছে। ঘরে ঘরে অন্নের জন্য, জলের জন্য কান্না, হাহাকার আর হানাহানি।

এই সব দেখে ওনার মনে খুব দয়া হল। সে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। ওনাকে এমন ভাবে দাঁড়াতে দেখে বনা বলল 'কি হল ওনা? তুমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে কেন?'

ওনা বনাকে নীচের করুন দৃশ্য দেখাল। সে বলল 'আমার কাছে তো অনেক জল আছে। আমার জলে সবার দুঃখ চোখের নিমিষেই দূর হয়ে যাবে। আমি এখনই এখানেই ঝড়ে যেতে চাই।'

এ কথা শুনে বনা হায়! হায়! করে উঠল। সে বলল 'একি বলছিস ওনা! এখানে ঝড়ে গেলে তোর এমন সুন্দর কুচকুচে কালো রূপ আর থাকবে না। তোর মেঘের অস্তিত্বই শেষ হয়ে যাবে। তুই চিরদিনের জন্য মরে যাবি। চল দুই বন্ধু মিলে হিমালয় পর্বতে যাই, সেখান বরফ হয়ে দীর্ঘদিন সুখে শান্তিতে থাকবো।'

ওনা বনার কথা না শুনে তখুনি ঝড়ে পড়ল মাটিতে। বনা তা দেখে বন্ধুকে খুব গালাগাল দিতে দিতে উড়ে গেল আকাশে।

ওনা মাটিতে ঝড়ে পড়তেই চারিদিকে খুশির বন্যা বয়ে গেল। আনন্দ উৎসবে সবাই মেতে উঠল। গাছপালা আবার সবুজ পাতা মেলল, বীজেরা আবার অঙ্কুর মেলে দিল। দেখতে দেখতে কিছু দিনের মধ্যেই আবার চারিদিক সবুজে সবুজ হয়ে গেল। চারিদিকে জলে থৈ থৈ। খাওয়া পড়ার আর কোথাও কোন অভাব রইল না। সবার মুখেই হাসি। এমনি করে বহু বছর পেড়িয়ে গেল।

বহু বছর পড়ে আবার একদিন যখন বনা কুচকুচে কালো মেঘ হয়ে ঐ জায়গা দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল তখন নীচে থেকে তার কানে একটি আওয়াজ ভেসে এল 'কি বন্ধু কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?' বনা থমকে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। সে দেখল সুবিশাল একটি বটগাছ মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে তাকে বলছে 'বনা, আমাকে তুমি চিনতে পেরেছ? আমি তোমার বন্ধু ওনা। এই দেখ আমি কত বিশাল এক বটগাছ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। লোকে আমার ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে, আমার চারিদিকে সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে, আমাকে ঘিরে লোকে মেলা নিয়ে বসে, আমাকে বনদেবতা বলে পূজা করে। বন্ধু আমি মরে গিয়েও খুব সুখে আছি। ওই দেখ আমার এক একটা জল বিন্দু ঐ দুরের বিশাল বিশাল শাল, সেগুন গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে, এই গ্রামের কোনায় কোনায় আমার কণা ছড়ি আছে নানান রূপে। আজ আমার মেঘের রূপ নাই কিন্তু অসংখ্য রূপে আমি ছড়িয়ে আছি। তুমি এখানে যেদিকেই পা দিবে আমাকে পাবে বন্ধু। কিন্তু এত বছর পরেও দেখি তোমার রূপ তেমনি আছে, তেমনি তুমি হাওয়ায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে উড়ে বেড়াচ্ছ? ভাল আছো তো বন্ধু? '

কোন শব্দ না করে বনা চুপ করে সেখান থেকে উড়ে গেল।

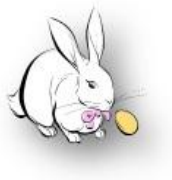

কোকিল পাখীর গান

- হরপ্রসাদ সরকার

এক বনে নন্দু নামে এক কোকিল পাখী ছিল। সে খুব মধুর গান করতে পারত। সে যখন গান করত তখন বনের হরিণরা চুপ করে তার গান শুনত। বনের পশু পাখী সবাই তার গানের খুব প্রশংসা করত। নিজের গানের এত প্রশংসা শুনে শুনে নন্দু কোকিলের মনে খুন অহংকার জন্ম নিলো। আগের নন্দু কোকিল আর আগের মত রইল না। সে বাকীদের সাথে যেমন-তেমন ব্যবহার করতে লাগল। তার মনের সেই কোমলতা আর রইল না।

একদিন নন্দু কোকিল ভাবল সে রাজাকে গান শোনাবে। রাজা তো তার গানের প্রশংসা করবেনই। আর রাজা যদি একবার প্রশংসা করেন তাহলে সারা দেশে তার খুব নাম হবে, যশ হবে। রাজার কাছ থেকে অনেক উপহার ও পাওয়া যাবে। এই ভেবে সে একদিন রাজ দরবারে হাজির হল। রাজ দরবারে হাজির হয়ে সে নিজেই নিজের খুব খুব প্রশংসা করতে লাগল। রাজা মনে মনে হাসলেন আর তাকে তার গান শুনানোর অনুমতি দিলেন।

নন্দু কোকিল তার গান শুনাতে শুরু করল। সে চোখ বন্ধ করে গান শুর করল। কিন্তু তার কন্ঠ হতে মধুর গান আর বের হল না। খুব ফেস-ফেস সুরে, তালে- বেতালে, সুরে-বেসুরে সে তার গান শুরু করল। সকল সভাসদ তার গান শুনে হা-হা হাসতে লাগল। কেউ দুর-দার করতে লাগল। কেউ উপহাস করতে লাগল।

ঘটনাটা এমন হবে নন্দু কোকিল তা স্বপ্নেও ভাবেনি। অপমানে, লজ্জায় সে রাজসভাতেই কান্না জুড়ে দিল। রাজা তখন তাকে বললেন 'মধুর স্বর আর অহংকারের স্বর এক সাথে একই কন্ঠ দিয়ে বের হতে পারে না। তাই নন্দু কোকিলের গলায় আজ আর মধুর স্বর নেই। অহংকারের স্বর, তার মধুর স্বরকে বের হতে দেয়নি।' অপমানে অভিমানে কাঁদতে কাঁদতে নন্দু কোকিল রাজসভা থেকে বেড়িয়ে গেল।

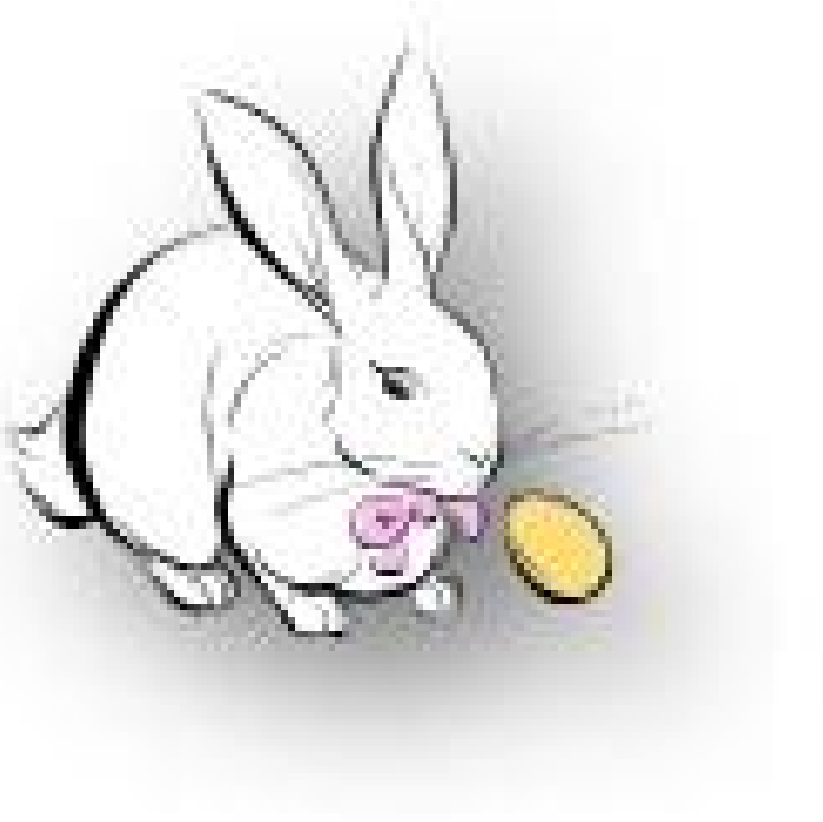

কুসুমজবার ঘাট

- হরপ্রসাদ সরকার

রাজ্যের রাজধানী শিউলনগর। সেই নগরের পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে অনেক অনেক গ্রাম পেড়িয়ে মৃদুলা নদী বয়ে গেছে অনেক অনেক দূর। তেমনি এক গ্রামে এক বিমাতা মায়ের ঘরে ছিল কুসুমজবা।

সৎ মা তাকে খেতে পড়তে দিত না। কুসুমজবার সোনার রূপ, ছিঁড়া আর মলিন কাপড়ে ঢাকা পড়ে থাকত। তবে কুসুমজবা ছিল বুদ্ধিমান, ধীর-স্থির, হিসেবি, সাহসী, নীতিপরায়ন ও সৎ। যেমন ছিল তার গায়ের রং তেমনি ছিল তার মনের রূপ। তার মা যখন মারা যায় তখন কুসুমজবা খুব ছোট। মা সব সময় বলতেন ' আমার কুসুম একদিন রাজরানী হবে। আমার কুসুম একদিন রাজরানী হবে।' মার সেই কথা কুসুম কখনো ভুলেনি।

দিন পেড়িয়ে গেল, বছর পেড়িয়ে গেল অনেক। কুসুমজবা রোজ ভোরে মৃদুলা নদীতে স্নান করতে যায়। স্নান পরে সে কলসি কাঁখে নিয়ে ফিরে আসে। একদিন সে দেখল খুব সুন্দর, কাঁসের থালার মত বড় একটি পদ্ম ফুল ভেসে ভেসে আসছে নদীর জলে। ফুলটি দেখে কুসুমজবার খুব ভাল লাগল। সে সাঁতরে নদীর মাঝে চলে গেল আর ফুলটি নিয়ে এল। পদ্মফুলটি বেশ সুন্দর। কিন্তু কি আশ্চর্য, নদীর পারে উঠতে না উঠতেই কুসুমজবার হাতের সেই তর-তাজা ফুলটি একটি ছোট্ট সোনার পদ্ম হয়ে গেল। কুসুমজবা বেশ চমকে উঠল। সে বুঝতে পারল এটি কোন মন্ত্রপূত ফুল। আর এত বড় একটি তাজা ফুল এমন ছোট্ট একটি সোনার ফুলে পরিণত হল, এতে ইশারা দেওয়া গেল যে এটি খুব

মূল্যবান, একে যত্ন করে সামলে রাখো। কুসুমজবা সোনার পদ্মফুলটিকে আঁচলে বেঁধে বাড়ি নিয়ে গেল আর সবার অলক্ষ্যে সেটি ঘরে কোনে একটি গোপন জায়গাতে রেখে দিল।

কিছুদিন পর আবার তেমনি ঘটল। তেমনি আরো একটি পদ্মফুল নদীর জলে ভেসে এল। কুসুমজবা সেটি নিয়ে পারে উঠতেই সেটি সোনার একটি ছোট্ট পদ্ম হয়ে গেল। এই ফুলটিকেও কুসুমজবা আগের মতই লুকিয়ে রাখল। কুসুমজবা লক্ষ্য করল যে অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পরে তৃতীয়ার চাঁদ যখন আকাশ উঠে সেই দিনই এই ফুলটি নদীর জলে ভেসে ভেসে আসে। এমনি ভাবে হিসাব মিলিয়ে কুসুমজবার কাছে ছয়টি ফুল জমা হল।

ওদিকে বৃদ্ধ রাজার আদেশে শিউলনগরের রাজগুরু যুবরাজের জন্য যোগ্য পাত্রী খুঁজতে প্রতি তৃতীয়াতে মন্ত্রপূত এই ফুল মৃদুলা নদীর জলে ভাসিয়ে দিতেন। ছয়টি ফুল ভাসানোর পর সপ্তম ফুলটি তিনি পরিকল্পনা মত তৃতীয়াতে না ভাসিয়ে অসময়ে পূর্ণিমার কাক-ভোরে ভাসিয়ে দিলেন আর গুপ্তচর আর সিপাহীদের মারফত ফুলটির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। পদ্মফুলটি ভাসতে ভাসতে সেই ঘাটের কাছেই এল যেই ঘাটে কুসুমজবা রোজ স্নান করে। ফুলটি সেই ঘাট ছেড়ে আর এগিয়ে গেল না। দীর্ঘক্ষণ ওখানেই ভেসে থেকে সেটি ডুবে গেল। এই খবর রাজা আর রাজগুরুর কানে যেতেই রাজপ্রাসাদে এক খুশির হাওয়া, আনন্দের হাওয়া বয়ে গেল। সবাই বুঝতে পারল যে নতুন মহারানীর নগর খুঁজে পাওয়া গেছে।

পরদিন রাজা সারা রাজ্যে ঘোষণা করে দিলেন যে, মৃদুলা নদীতে দ্বিতীয়ার ভোরে একটি মন্ত্রপূত পদ্মফুল ভাসানো হবে। যে সেই ফুলটিকে ধরতে পারবে তার সাথে যুবরাজের বিয়ে হবে। কিন্তু মনে থাকে যেন, এটি একটি মন্ত্রপূত পদ্মফুল আর এটি শুধু ভাবি মহারানীর হাতেই আগের ফুলগুলির মত রং বদলাবে। কেউ যদি দুঃসাহস করে ফুলটি হাতে নেয় আর যদি ফুলটির রং না বদলায় তবে রাজ আদেশে তুরন্ত তার মৃত্যুদণ্ড হবে।

সারাদেশের লোক পরের দিন সেই ফুলটি দেখতে, ভাবি মহারানীকে দেখতে মৃদুলার পারে পারে জমা হল, কিন্তু কেহ নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে, সাহস করে সেই ফুলটি ধরতে নদীতে নামেনি। কুসুমজবা আজ সেই নদীতেই যায়নি। সে ঘরে কোনে বসে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। সেই ফুলটি ভাসতে ভাসতে আজো এসে সেই কুসুমজবার ঘাটেই আটকে গেল। আর দীর্ঘক্ষণ সেখানে ভেসে শেষে ডুবে গেল।

রাজগুরু মহারাজকে চিন্তিত হতে দেখে বললেন ‘মহারাজ আপনি কিছুই ভাববেন না। আমরা যথার্থই যোগ্য মহারানী খোঁজে পেয়েছি, তিনি সবার সামনে নিজের দম্ভ প্রকাশ করতে চান না। আর তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান আর হিসেবী। তা না হলে আমার মন্ত্রপূত ফুল এমন ভাবে এখানে ভেসে থেকে শেষে ডুবে যেত না। ডুবে গিয়ে ফুলটি ইশারা করে গেল যে আগের ছয়টি ফুলই ভাবি মহারানী পেয়েছেন আর ফুলগুলি তার কাছেই আছে। সুতরাং হিসাব মত আর নিয়ম মত আগামীকাল তৃতীয়ার ফুল আবার মৃদুলার জলে ভাসবে। আর এই ফুলটিই মহারানীকে বের করে আনবে।‘

পরের দিন সেই কাক-ভোরেই গোপনে গুপচরেরা ছড়িয়ে রইল কুসুমজবার ঘাটের আসে পাশে। রাজগুরু মন্ত্র পড়ে শেষ ফুলটি ভাসিয়ে দিলেন মৃদুলার জলে। এদিকে প্রতিদিনের মত ভোর বেলাতে কুসুমজবা চলল ঘাটে স্নান করতে। তৃতীয়ার সেই

পদ্মফুলটিও ভেসে আসতে লাগল। কুসুমজবা সাঁতরে গেল নদীর মাঝে, সেই ফুলটিকে নিয়ে পারে উঠে এল। কিন্তু কি আশ্চর্য আজ সেই ফুলটি আজ আর ছোট্ট সোনার ফুলে বদলে গেল না। বিস্ময়ে কুসুমজবা এর কারণ ভাবতে লাগল কি আচানক তার নিজের শরীরটাই নিজের কাছে ভারি ভারি মনে হল। নিজের অঙ্গের দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। সারা অঙ্গে তার রাজরানীর গয়নায় ভরে গেছে। গলায় হীরা, মনি-মুক্তার মালা। দু-হাতে সোনার চুড়ি ছনছন করছে। কানে হীরার দুল। খোঁপায় হীরার চূড়ামণি। গায়ে রেশমের মখমলে শাড়ী। পায়ে অপরূপ রূপার নূপুর। অবাক চোখে কুসুমজবা নিজেই নিজেকে দেখতে লাগল।

ফুলটি আজ নিজে বদলায়নি, কিন্তু কুসুমজবাকেই বদলে দিয়েছে। আজ আর কুসুমজবার লুকানোর জায়গা রইল না। সাথে সাথেই কুসুমজবার ঘাটের চারিদিকে শঙ্খধ্বনি বাজতে শুরু হয়ে গেল। নদীর উভয় পারে বেজতে লাগল ঢোল-নাগারা। সৈন্য সিপাহীরা সবাই ভাবি মহারানীর জয় ধ্বনি করতে লাগল। খবর গেল রাজগুরু আর মহারাজার কাছে। সারা গ্রামের লোক দেখল দীন-দুঃখী, হতভাগী কুসুমজবাকে রাজকীয় সম্মানে দেশের যুবরাজ নিজের রথে নিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে ফিরে যাচ্ছেন।

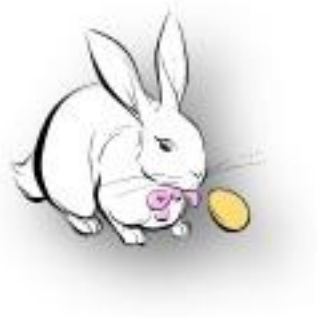

হিংসুটে পাতা

- হরপ্রসাদ সরকার

গভীর বনে এক ফুল বাগান। চারিদিকে শাখায় শাখায় রং-বিরঙ্গের ফুল ফুটে আছে। পাখীরা আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে, শাখায় শাখায় বসে গান করছে। রঙ্গিন প্রজাপতিরা ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবুজ পাতারা সূর্যের আলোতে তরুণ তাজা হয়ে আছে। চারিদিকে খুশির হাওয়া, আনন্দের হাওয়া। একটি শাখায় শুধু একটি কলি অঝরে কেঁদে যাচ্ছে। তার কান্নার শব্দ কারো কানে গেল না। শুধু সেই গাছটি কলিটি কান্নার শব্দ শুনতে পেল। গাছটি কলিটিকে জিজ্ঞাস করল ‘ভাই! সবাই হাসছে, নাচছে, গাইছে আর তুমি একা বসে কাঁদছ কেন?‘

কলিটি কাঁদতে কাঁদতে বলল ‘ দেখ ভাই আমি যতবার প্রাণ ভরে, সুন্দর হয়ে সেজে গুজে ফুল হয়ে ফোটে উঠার চেষ্টা করি , ততবারই পাশের গাছের পাতাগুলি আমার সাথে হিংসা করে আমাকে ঢেকে রাখে। ফলে আমার কাছে কোন আলো পৌঁছায় না। পাখীরা-প্রজাপতিরা আমাকে দেখতে পায় না। আমি তাদের সাথে খেলাও করতে পারিনা। কত বার আমি এভাবেই কেঁদে কেঁদে ঝড়ে পড়েছি। বারবার আমি নতুন আশা নিয়ে, আরো সুন্দর মনমোহক আর রঙে নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে ফুল হয়ে ফুটে উঠেছি। কিন্তু প্রতিবারই আমি তাদের কাছে হেরে গেছি। আজো হেরে যাবো। এবার ও কোন পাখী আমাকে দেখতে পারবে না, কোন প্রজাপতি আমার সাথে খেলা করবে না। তাই মনের দুঃখে আমি কাঁদছিলাম।‘

গাছটি হেসে বলল ‘তাইই বুঝি। তবে আমি তোমাকে এই সমস্যার সমাধান বলে দিতে পারি।‘

কান্না থামিয়ে কলিটি বলল ‘কি সমাধান?‘

গাছটি বলল ‘দেখ ভাই, তুমি তোমার রূপের কথাই শুধু চিন্তা করেছ আর তোমার রূপকেই তুমি শুধু বাড়িয়েছ। এতে কখনোই তেমন কিছু কাজ হয় না। তবে তোমার কাছে তোমার রূপ ছাড়াও আরো একটি জিনিস আছে আর সেটি হল তোমার গুন। তোমার সৌরভ। তোমার রূপ নয় পাতার আড়ালে ডাকা পড়ে গেল, কিন্তু তোমার সৌরভকে কে আটকাতে পারবে? তুমি তোমার চেষ্টায় তোমার সৌরভকে এত সুন্দর, মধুর আর মিষ্ট করে তোল যেন প্রজাপতি, ভ্রমর আর পাখীরা পাগলের মত খুঁজতে খুঁজতে তোমার কাছে আসে।‘

কলিটি তাইই করল। তার মিষ্ট-মধুর গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বনের কোনায় কোনায়। ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি, ভ্রমর ছুটে এল সেই সৌরভের টানে। সেই হিংসুটে পাতারা অনেক চেষ্টা করেও তাকে আর ঢেকে রাখতে পারেনি। প্রজাপতিরা, ভ্রমরেরা পাতার আড়ালে খুঁজে বের করল সেই ফুলটিকে। দলে দলে পাখীরা উড়ে এল ফুলটির কাছে আর নিজেদের ডানা আর পায়ের আঘাতে আঘাতে হিংসুটে পাতাদের ছিন্ন-ভিন্ন করে দিল। ডাল ভেঙ্গে হিংসুটে পাতারা লুটিয়ে পড়ল ধুলায়।

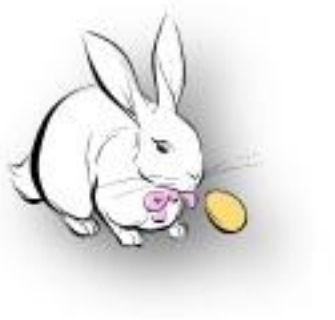

ছোট উপন্যাস -

অপুর কথা

- হরপ্রসাদ সরকার

(১ম পর্ব)

সে অনেক অনেক দিন আগের, ঈশানপুরের কথা। ঈশানপুর আগরতলা শহর থেকে অনেক অনেক দূরের এক গ্রাম। গ্রামে যাবার তেমন কোন বড় রাস্তা নেই। মাটির পথটি একটু প্রসস্থ। ঐটুকুই।

গ্রামের পাশ দিয়ে চলে গেছে গোমতী নদী। সব সময়ই জল ভরপুর। তাই ছোট্ট অপুকে তার মা সব সময় বলত "অপু, তুমি কিন্তু কখনো ঐ নদীর দিকে একা যাবে না। যদি যাও তবে কিন্তু আমাকে আর পাবে না। আমি চিরদিনের জন্য তোমাকে ছেড়ে ঐ আকাশে চলে যাব।"

সজলার আদরের ছোট্ট অপু কতটুকুই কি বুঝত কে জানে? তবে সে ফ্যাল ফ্যাল করে তার মার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকত। চুপ করে মা'র গলা জড়িয়ে ধরে মার বুকে মাথা রেখে দিত।

ব্রজহরি আর সজলার আদরের ধন অপু। অভাবী সংসারেও অপুর আলতো আলতো কথাতে হেসে খেলে দিন চলে যাচ্ছিল তাদের। ঐ শ্রাবণ মাসে চারিদিকে জল থৈ-থৈ। অপু সকাল বেলা চুপি চুপি কাউকে কিছু না বলে একা একা গুটি গুটি পায়ে চলে এল গোমতীর পারে।

নদীর পারে পারে হাঁটল অনেকক্ষণ। নদীর পাশের সেই মাটির পথটিতে বসে মহা-আনন্দে তাকিয়ে রইল সেই গোমতীর দিকে। যখন তার খেলা শেষ হল সে আবার চুপিচুপি ফিরে চলল বাড়ির দিকে।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই সে দেখল বাড়িতে অনেক লোক। গ্রামবাসীরা অনেকেই কাঁদছে। তার মাকে উঠানে শুইয়ে রাখা হয়েছে। বাবা মাকে জড়িয়ে ধরে অঝরে কাঁদছে। কিন্তু মা কোন কথা বলছে না।

অপু মা মা বলে দৌড়ে গেল মার কাছে। সে মা'র গলা ধরে মা কে ডাকতে লাগল। মা চোখও খুলল না, কথা ও বলল না। অপু মাকে জড়িয়ে অনেকক্ষণ কাঁদল। কিন্তু মা আর উঠল না। শেষে গ্রামবাসীরা সবাই মিলে মা'কে একটা কলা গাছের ভেলাতে গোমতীর জলে ভাসিয়ে দিল।

অপু দেখল মা চলে যাচ্ছে অনেক দূরে। সে অঝরে কেঁদে কেঁদে মা মা বলে কত ডাকতে লাগল। মা আর ফিরে এল না। বাড়ির চারিদিকে মা'র স্মৃতি ছড়িয়ে রইল।

সকাল হলেই অপু চলে যায় তার মা'র কাছে। গোমতীকে সে তার মা বলেই ভাবতে লাগল। যতক্ষণ সে গোমতীর পারে পারে থাকে, তার মনে হয় সে তার মার পাশেই আছে। গোমতীর জলে সে হাত দিয়ে বসে থাকে। ভাবত মার শরীরেই হাত রেখেছে। গোমতীর তীরে মাটিতেই শুয়ে থাকে, ভাবে মার কাছেই শুয়ে আছে। শেষে এক সময় বাবা এসে , আদর করে কুলে করে নিয়ে যায় , স্নান করায় , ভাত খাওয়ায়। তারপর বাবাকে একটু ফাঁকি দিয়েই আবার তার মা'র কাছে চলে আসে অপু।

কিছু দিনের মধ্যেই বাবা একটা নতুন মা নিয়ে এল। ব্রজবাসী। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অপুর একটা বোন ও এল। অপু শুধু জানত যে এটা তার আদরের ছোটবোন। বোনের ডান হাতের তালুতে এই বড় লাল তিলটা তার খুব ভাল লাগত।

নতুন মা অপুকে কোনদিন ভালবাসে নি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ঘুম থেকে উঠার আগে থেকেই শুরু হয়ে যেত চড়, লাথি। সারা দিন সেটা লেগেই থাকত। আজ অপু পেট ভরে খেতেও পায় না। কেউ খোঁজ রাখে না অপুর।

ছোট অপু ঘরের পিছনে লুকিয়ে লুকিয়ে অঝরে কাঁদে। মা'র কথাই শুধু মনে পড়ে। ভাবে কবে আবার মা আসবে ? তাকে আবার আদর করবে ?

সে দিন অপুর খুব জ্বর। আগের দিন রাতেও খাবার জোটেনি। ভোর হতে না হতেই কপালে জুটল লাথি। নতুন মা তাকে গোমতীতে পাঠাল জল আনতে।

ছোট অপু , ছোট্ট একটা কলসি নিয়ে কাঁপা পায়ে, দুর্বল পায়ে চলল তার মা'র কাছে। মা'র কুলে বসে ,হাতে তার ছোট্ট কলসি নিয়ে সে অপলক মা'র পানে চেয়ে রইল। ছোট্ট অপুর চোখ দিয়ে নীরবে বয়ে চলল জলের ধারা।

হঠাৎ তার চোখের সামনে নেমে এল অন্ধকার। রুগ্ন, শীর্ণ, ক্লান্ত অপুর আর কিছু মনে নেই। সে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল তার মায়ের কুলে, গোমতীর তীরে। যখন অপুর ঘুম ভাঙ্গল, তখন সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল সে একটা বিশাল ঘরের, খুব সুন্দর একটা খাটে, মখমলে বিছানায় শুয়ে আছে আর তার চারপাশে অনেক লোক। কাউকে সে চিনে না।

সে দেখল ঠিক তার মা'র মতই দেখতে একজন বসে আছে তার শিয়রে। তাঁর চোখে জল। অপু তাঁকে মা বলেই ভাবল আর মা-মা বলে চীৎকার করে বিমলার গলা জড়িয়ে ধরল। বিমলাও মা'র মতন অপুকে বুকে জড়িয়ে ধরতেই অপু আবার জ্ঞান হারাল।

মাঝরাতে অপুর যখন আবার জ্ঞান ফিরে এল, সে দুর্বল সুরে মা-মা বলে মা'কে ডাকতে লাগল। বিমলা অপুর পাশেই ছিল। সে অশ্রু ভরা হাসি মুখে অপুর কপালে চুমু দিতে দিতে বলল "এই তো মা, আমি এখানে? তুমি ঘুমাও, আমি আছি তোমার পাশে।"

অপু তেমনি দুর্বল সুরে মাথা নাড়িয়ে বলল "তুমি আবার আমাকে ফেলে চলে যাবে না তো ? আমার যে খুব কষ্ট হয়।" চোখের জলে ভেসে অপুর হাতটাকে নিজের হাতে নিয়ে বিমলা বলল "না, মা, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। কক্ষনো যাব না। তুমি তো আমার সোনামণি। এবার তুমি ঘুমাও !"

অপু তেমনি মাথা নেড়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অপু এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। সে এখন আগরতলার বিখ্যাত রায় বাড়ির ছোট মালকিন, অপরাজিতা। কোটিপতি ব্যবসায়ী উপেন রায়ের একমাত্র মেয়ে। ছোট্ট অপুর চারপাশে সব সময় দু-চার জন চাকর বাকর থাকে অপুকে দেখা শোনা করার জন্য। অপু কখনো বাবার কুলে বসে ,কখনো মার কুলে বসে মোটরে করে ঘুরে বেড়ায়।

মা'র গলা জড়িয় ধরে গল্প শোনে। বাবার কাঁদে চড়ে ফুল পারে। উপেন রায় আর বিমলার দীর্ঘদিনের শূন্য ঘরে অপুকে নিয়ে খুশীর হাট বসল। মা এক পলক ও চোখের আড়াল করেন না অপুকে। আর উপেন রায় মেয়েকে না দেখে কাজেই বের হন না। দুজনেরই নয়নের মনি অপু ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। পুরানো অনেক স্মৃতি তার মন থেকেও মুছে গেল।

(২য় পর্ব)

আজ অপু উকালতি পাশ করেছে। বাবা মায়ের অতি আদরের অপু , তার বাবা মাকে ভীষণ ভালবাসে। তবে ধনীর এই মেয়েটি অতি সাধারণ, শান্ত , স্নিগ্ধ, সুশীল।

অনেক দিন পর আবার বাবা, মা'র সাথে মোটরে করে বেড়াতে বের হল অপু। শহরের রাস্তা ছেড়ে মাটির পথ ধরে শোঁ শোঁ করে সাদা মোটর ধুলা উড়িয়ে ছুটল। সেই ঈশানপুরের দিকে।

ওখানে উপেন রায়ের অনেক জমি-জামা আছে, আছে বেশ বড় বাড়ি। আজ থেকে সতের আঠার বছর আগে তেমনি একবার বিমলাকে সাথে নিয়ে বেড়াতে এসেছিলেন ঈশানপুরের বাড়ীতে। ফিরে যাবার সময় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন ছোট্ট অপুকে এখানে। আধা ডাঙ্গায়-আধা জলে প্রায় মৃত পড়েছিল অপু। নাড়ী ধরে দেখলেন চলছে না। ডাকা ডাকি করেন কিছুক্ষণ। কিন্তু কোথাও মানুষ জন দেখতে পেলেন না। হঠাৎ মনে হল এখনো কোথাও কোথাও কুসংস্কার আছে মৃতকে নদীর পাশে ফেলে রাখা হয় শিয়াল, কুকুরের জন্য।

উপেন রায় আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলেন না। কোন আশা নেই মেয়েটির বেঁচে থাকার তবু এত সুন্দর, এত ফুটফুটে মেয়েটি যদি বেঁচে যায় তবে তো আমার মেয়ে হয়েই বাঁচবে। যা হবার পরে হবে , দেখা যাবে তখন। ঝড়ের বেগে গাড়ী চালিয়ে বাড়িতে এসেছিলেন সে দিন। তেমনি দুই তিন ডাক্তার এসে হাজির হল , ঔষধ পত্র ও

এসে গেল। অপু ফিরে পেয়েছিল নতুন জীবন আর উপেন-বিমলার ঘর আলো করেছিল ছোট্ট অপু।

ওদিকে দুদিন পর ব্রজহরির মনে হল অপুর কথা। খোঁজ শুরু হল অপুর। তখন আর কোঁথাও অপুকে পাওয়া গেল না। নদীর ধারে পাওয়া গেল তার কলসি। সবাই ভাবল অপু নদীর জলে ভেসে গেছে।

ব্রজহরি সে দিন থেকেই অপু অপু করে পাগল হল। ব্রজবাসী আজ তার চোখের বিষ। সারাদিন নেশার সাগরে ডুবে থাকে ব্রজহরি আর হঠাৎ হঠাৎ অপু, অপু বলে চীৎকার করে কাঁদে। কোন কাজের আজ তার হুঁশ নেই।

তবে সংসার চলবে কি ভাবে। ব্রজবাসী ঝি এর কাজ করে। গ্রামে আর ক'জন ঝি দিয়ে কাজ করায়। তাই কখনো শুকনো লাকড়ি নিয়ে বাজারে বেচতে যায় আবার কখনো পূজা পার্বণের আগে ফুলের মালা বেচে বাজারে। খেতে না পেয়ে পেয়ে চোখের আলো কমে গেছে , শ্বাসরোগ এসে ঘরে করেছে বুকে। আজ সে তেমন কিছুই ভাল চোখে দেখে না , দু কদম চলতে ও পারে না। দিন রাত তার চোখেও জল থাকে। তার মন ও আজ অপুর জন্য হাহাকার করে। মনে মনে শতবার সে ক্ষমা চায় ভগবানের কাছে , অপুর কাছে।

সে জানে সে আর বেশী দিন হয়তো বাঁচবে না। অপুর মত সেও হয়তো অকালেই মারা যাবে। তা হোক কিন্তু তার পেটের মেয়েটি যেন বেঁচে থাকে। মিলি যেন বেঁচে থাকে। সেও বড় কষ্ট করে বড় হচ্ছে। বাবা-মা'র সাজা সে ও পাচ্ছে। কখনো খেতে পায় , কখনো পায় না। তবু মুখ ফুটে কিছুই বলে না।

আজ সংসারের ভার তার উপর , সে মার মতই লোকের বাড়িতে ঝি খাটে , বাজারে ফুল বিক্রি করে , শুকনো লাকড়ি বিক্রি করে তবেই ঘরে চাল, ডাল আসে। জীবন তো চলছে তবে তা মরার মত।

আজ আবার সেই ঈশানপুর সেই মাটির পথে, সেই গোমতী নদীর পাশ দিয়ে চলছে উপেনবাবুর গাড়ী। সেদিন অপু ছিল মাটিতে আজ গাড়ীতে।

সন্ধ্যা প্রায় নেমে এসেছে। ছোট্ট বাজার , হাল্কা হাল্কা বাড়ি-ঘর। গোমতীর পাশ দিয়ে যখন গাড়ীটি ছুটছে, সাঁঝের আলোতে নদীটিকে দেখে অপুর মনে এক অচেনা শিহরন জাগল, এক অচেনা খুশীতে অপুর মনটা হঠাৎ ভরে গেল। না জানি কেন তার দু চোখ বেয়ে কয়েক ফুটা জল গড়িয়ে পড়ল। উপেন আর বিমলা ও উদাস চোখে সেই গোমতীর দিকে তাকিয়ে রইল। এখানেই তারা কুড়িয়ে পেয়েছিল তাদের প্রাণের ধন।

ভোর হল , আজ যেন সূর্যটা এক নতুন ছন্দ নিয়ে এল জীবনের। সকালবেলা নন্দু আর রামুকে সাথে নিয়ে ঈশানপুরটা একটু ঘুরে দেখতে বের হল অপু। নন্দু আর রামু রায়-বাড়িতেই কাজ করে। পায়ে হেটে , মাটির পথটা তার বেশ লাগছিল। ভোরের নতুন সূর্য , তাজা হাওয়া আর ঐ দূর দূর পর্যন্ত সবুজ ধানের খেত। হাটতে হাটতে তারা চলে এল গোমতীর পারে। গোমতীকে দেখেই আবার যেন তার মনটা খালি হয়ে গেল। সে একটু ভাবুক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল গোমতীর দিকে। আবার নীরবে হাটতে শুরু করল। চলতে চলতে এক জায়গায় এসে হঠাৎ সে আবার থমকে দাঁড়াল। মনে হল যেন খুব চেনা , খুবই চেনা এই জায়গাটা , যেন কত বার সে এখানে এসেছে। কিন্তু তবু যেন অচেনা।

অপু বেশ অবাক হল। এদিক ও দিক তাকিয়ে পিছন ফিরে নন্দুকে বলল " নন্দু! এদিক দিয়ে কি নদীটার কাছে যেতে পারব ?"

নন্দু দৌড়ে কাছে এসে জবাব দিল " হ্যাঁ, দিদিমণি। চলুন।"

অপু এবার আবার তার মা'র পাশে। তবে চিনতে কেন সময় লাগছে ? নদীটা যেন কথা বলতে চাইছে অপুর সাথে। অপু যেন বুঝতে পারছে না। অপু নদীটার আরো কাছে গেল, হাত রাখল নদীর ফটফটে জলে। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক হাত নাড়ল নদীর জলে। হঠাৎ তার বুকটা ধক-ধক করে কেঁপে উঠল। সে বিদ্যুতের মত পিছন ফিরে তাকাল উল্টো দিকের মাটির পথটির দিকে। একটা চীৎকার যেন বেড়িয়ে এল বুকের ভীতর থেকে। মাঃ-। চোখ দিয়ে তার ঝড়ের বেগে নেমে এল ধারা। আর কিছুই বাকী রইল না।

সে যেন পাগলের মত দুই হাতে নদীর জলটা জড়িয়ে ধরতে চাইল। মা'কে জড়িয়ে ধরতে চাইল। পরল না। আবার চেষ্টা করল , পারল না। সে যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে মা ' র কোলে। আর মা ও যেন তার মতই আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরতে চাইল। বড় বড় ঢেউ এসে ভিজিয়ে দিতে লাগল অপুকে। অপু দু পা নেমে গেল জলে। আনন্দ , খুশী , দুঃখ নিয়ে সে অনেকক্ষণ মা ' কে জড়িয়ে ধরে রইল , মার পানে চেয়ে রীল। সে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। শেষে নদীর জলটা কপালে ঠেকাল , মাথায় রাখল।

মা'কে ফিরে পাওয়ার আনন্দ শুধু সেইই বুঝল।

মার পাশে অনেকক্ষণ বসে থেকে অপু উঠে এল। ধীর পায়ে এগিয়ে চলল সেই উল্টা দিকের মাটির পথে। নন্দু আর রামু কিছুই বুঝতে পারল না শুধু তেমনি দিদিমণির পিছন পিছন চলতে লাগল।

অপুর চোখের সামনে ভেসে উঠল একে একে সেই পুরানো দিনের স্মৃতি। ছোট্ট অপু, সেই হারিয়ে যাওয়া অপু আবার ধীর পায়ে ফিরে চলল নদীর তীর থেকে তার বাড়ীতে। অপু ধীর পায়ে এগোতে লাগল। পায়ে পায়ে সে সোজা নিজের বাড়ির সামনে। একে একে সব অংক তেমনি মিলে গেল। চোখ দুটা ছলছল করে উঠল। একটা চাপা কান্না বেড়িয়ে এল ভীতর থেকে।

অপু আর এগিয়ে গেল না। ফিরে এল। নন্দুকে বলল "এখানে কোথাও চা পাওয়া যাবে। একটু বসে চা খাব।" ঘুরতে ঘুরতে যখন তারা বাজারে চা খেতে এল তখন সূর্য বেশ একটু তাজা হয়েছে। হাল্কা খিদে ও পেয়েছে। এক মিষ্টি দোকানের সামনে যেতেই কয়েকজন দৌড়ে এসে বসার জায়গা করে দিল। দিদিমণিকে কেউ চিনে না তবে নন্দু আর রামুকে তো সবাই চিনে। তাই আর দিদিমণিকে চিনতে কারো বাকী রইল না।

চা আর একটু হাল্কা মিষ্টি খেয়ে ওরা দোকান থেকে বের হতেই একটা মেয়ে হুমড়ি খেয়ে সামনে এসে পড়ল। বয়স সতের আঠার , মলিন জামা গায় , রুক্ষ চুল। তবে চেহারা সুন্দর কিন্তু মুখে দরিদ্রতার ছাপ স্পষ্ট।

দিদিমণি, দিদিমণি বলে সে এক গাল হেসে কতকগুলি ফুলমালা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছিল না। কিন্তু চোখ দুটি যেন করুন কান্নায় অনেক কিছুই বলে দিচ্ছিল।

অপু নিজেকে সমলে নিয়ে বলল "কিছু কি চাই তোমার ?"

ভীতু সুরে মেয়েটি বলল " ফুল লাগবে দিদিমণি ?" এই বলে সে তার দুই হাত বাড়িয়ে দিল অপুর দিকে। অপু ফুলগুলির দিকে একবার তাকিয়ে মেয়েটার চোখের দিকে তাকাল।

এই চোখগুলি ও যেন সেই নদীটারই মত কিছু বলতে চাইছে তাকে। অপু একটু তীক্ষ্ণ নজরে মেয়েটার দিকে তাকাল, যেন কিছু খোঁজতে চাইছে তার চোখে।

অপু আরো একটু কাছে এলো মেয়েটার। চোখ ঘুরিয়ে আবার সেই ফুলগুলির দিকে তাকাতেই মেয়েটির হাতের সেই বড় লাল তিলটি যেন দিনের সূর্যের মত আলোকিত হয়ে উঠল। অপু থপ করে সেই হাতটা চেপে ধরল। "এটা কিসের দাগ ?"

মেয়েটা থতমত খেয়ে গেল। একটু লাজু স্বরে বলল " দিদিমণি এটা জন্ম থেকেই আমার হাতে।"

অপু সাধারণ হওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না , তেমনি পাথরের মত বলল " তোমার বাবার নাম? "

মেয়েটা আরো অবাক হয়ে গেল, বলল " আমার বাবার নাম ব্রজহরি।"

হঠাৎ বাবার নামটা মেয়েটার মুখে শুনে , অপুর পা দুটি যেন অবশ হয়ে এল। অপু আরো শক্ত করে চেপে ধরল মেয়েটার হাত। যেন সে সাত রাজার ধন খোঁজে পেয়েছে আর তা যেন হাত থেকে ছুটে না যায়। সে তেমনি অপলকে তাকিয়ে রইল সেই মেয়েটির দিকে। আজ তার খুশীর ঠিকানা নাই। এই তার সেইই ছোট বোন। অপু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলো। বুকের কান্না, হাহাকার চেপে রেখে অনেক কষ্টে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল " কি নাম তোমার ?"

- মেয়েটি তেমনি অবাক সুরে বলল "মিলি।"

অপু মুখের কাঁপা হাসিতে বলল "বাঃ খুব সুন্দর নাম। আমার নাম অপরাজিতা। তোমার ফুলগুলির দাম কত?"

মিলি হাসির সুরে বলল "এটা এক টাকা, এটা দুইটা ...।"

অপুঃ আরে না না। সব গুলির দাম কত ?

মিলি যেন প্রথমে বিশ্বাস করতে পারল না নিজেকে। তেমনি অবাক সুরে বলল "মানে ?"

অপুঃ মানে ! আমি তোমার সবগুলি ফুল কিনতে চাই ? তার দাম কত ?

মিলি যেন আকাশ থেকে পড়ল। এই প্রথম তার সব ফুল বিক্রি হবে। তার মুখ দিয়ে সত্য কথাই বেড়িয়ে গেল। সে বলল "দিদিমণি আজ পর্যন্ত আমার সব ফুল কোন দিন বিক্রি হয়নি। তাই আমি নিজেও জানি না এর দাম কত ? আপনি যা দিবেন আমি তাইই নেব।"

অপুঃ তবে আমার দুটি শর্ত আছে।

মিলি অবাক চোখে বলল "মানে ?"

অপুঃ আমার সাথে বসে ঐ দোকানে চা-সিঙেরা খেতে হবে। কাল আমাদের বাড়ীতে পূজার ফুল দিতে হবে। যদি তুমি রাজি থাক তবে আমি সব ফুল কিনি !

মিলি যেন ভেবে পাচ্ছিলনা কি হচ্ছে। সে তেমনি হা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নন্দু আর রামুও অবাক হয়ে একে অপরকে দেখছিল।

অপুর টানে মিলির চমক ভাঙ্গল। সে দিদিমণির সাথে গিয়ে চেয়ারে বসল। এসে গেল গরম চা , গরম সিঙেরা। জীবনের এই প্রথম তার সকাল বেলায় চা-নাস্তা। মিলি ছলছল চোখে দিদিমণির দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু দিদিমণির চোখ কেন ছলছল করছিল , কোন খুশীতে ছলছল করছিল, তা সে বুঝতে পারেনি।

চা-নাস্তা শেষ হলে অপু ব্যাগ খুলে একটা ৫০ টাকার নোট বাড়িয়ে দিল মিলির দিকে। “এই তোমার ফুলের দাম। হবে তো ? নন্দু , ফুল গুলি নিয়ে নাও তো।”

মিলি ভেবেই পাচ্ছিল না এ কি হচ্ছে। সে হতবাক হয়ে বলল “কিন্তু দিদিমণি ?”

অপু জানে ফুলগুলির দাম এত নয় , তবু মিলিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলল “কাল আমাদের বাড়িতে ফুল দিতে পারবে তো ? ঐ রায়-বাড়ি চিন ?”

মিলি খুশীতে খুশীতে বলল “হ্যাঁ , দিদিমণি চিনি।”

অপুঃ ঠিক আছে। কাল ফুল নিয়ে আসবে কিন্তু। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব।

অপু বাড়ির পথে পা বাড়াল। পিছন পিছন নন্দু আর রামু। মিলি তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না সব কিছু।

ফিরার পথে মিলির ফুল-মালা হাতে নিয়ে অপু কত যে আদর করল তাতে। কত বার বুকে জড়াল , গালে জড়াল। দুপুরের ঠিক আগে তারা ঘরে ঢুকল।

(৩য় পর্ব)

পরদিন সেই কাক ভোরেই মিলি এক পুটলি ফুল নিয়ে রায় বাড়ির সদর দরজায় হাজির। শহরের নতুন দারোয়ান মিলিকে চিনে না , তার উপর দিদিমণি এখুনি ঘুম থেকে উঠেনি তাই সে মিলিকে ভীতরে যেতে দিল না। মিলি দরজার বাইরেই অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই ভীতর থেকে দারোয়ানের ডাক পরল। দারোয়ান যেমন দৌড়ে ভীতরে গিয়েছিল তেমনি দৌড়ে আবার ফিরে এসে সদর দরজা খুলে দিল আর খুবই সমাদর করে মিলিকে ভীতরে নিয়ে গেল, বসার জায়গা করে দিন। তার এমন ব্যবহারে মিলি অবাক। সে সেই সুন্দর চেয়ারটাতে বসল। সুন্দর সেই বাড়িটার এদিক ওদিক ফিরে ফিরে দেখতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন এসে রাজকীয় জলখাবার দিয়ে গেল। এমন খাবার সে ভাবতেই পারে না। কাল থেকে সব অবাক করা ঘটনা সব তার সাথে হচ্ছে। একটু ভয় মিশ্রিত আনন্দে সে খাবারের দিকে মন দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একগাল মিষ্টি হাসি হেসে দিদিমণি সামনে হাজির। মিলি ধর-ফরিয়ে খাবার ছেড়ে , চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মুখে তার খাবার ভরা তাই কিছু বলতেই পারল না। হা-হা করে হেসে উঠল অপু। পাশে এসে বসল। মিলির হাত থেকে ফুলের পুটলিটি নিয়ে কিছুক্ষণ প্রাণ ভরে দেখল মিলিকে , গালে আদর করল , মাথায় আদর করল। তারপর পিছনে রাখা একটা ছোট ব্যাগ মিলির হাতে তুলে দিল। বলল বাড়িতে গিয়েই যেন সে এ ব্যাগটা খুলে আর দুপুরে মা-বাবাকে নিয়ে যেন অবশ্যই পূজার মহা-প্রসাদ নিতে আসে।

মিলি বাড়িতে এসে খুব উৎসুক মনে সেই ব্যাগটি খুলল। ছানাভরা চোখে দেখল তাতে খুব সুন্দর একটা দামী জামা , ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি , একটা সুন্দর শাড়ী। নতুন জামা পেয়ে মিলি খুশিতে নেচে উঠল। নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি দেখে নেশার ঘোরেও ব্রজহরির চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। আধা অন্ধ, অসুস্থ মা'র কাছে আজ আর এই নতুন

শাড়ীর তেমন কোন মূল্যই রইল না। তবু সে শাড়ীটা হাতে নিয়ে বলল "আমাকে ক্ষমা করে দে অপু , ক্ষমা করে দে।"

দুপুরে রায় বাড়িতে সারা গ্রামের লোকের ভিড়। পূজা শেষে মহা-প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে। বিশাল প্যান্ডেলে প্রচুর লোক সারি বদ্ধ ভাবে মহা-প্রসাদ খেতে বসছে। তাদের খাওয়ার শেষে আবার নতুন দল খেতে বসেছে। এমনি সময় নতুন জামা কাপড় গায়ে মিলি তার মা-বাবার হাত ধরে রায় বাড়িতে ঢুকল। সাথে সাথেই সকালের সেই দারোয়ান দৌড়ে এল। খুব আদর আপ্যায়ন সহকারে তাদের ভীতরে নিয়ে গেল। বসতে দিল। তাদের বসিয়ে সে তেমনি দৌড়ে গিয়ে দিদিমণিকে খবরটা দিল।

কথাটা শুনে অপু যেন পাথরের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না বাবাকে আবার দেখবে , মা'কে আবার দেখবে। এতদিন পর সেই হারিয়ে যাওয়া অপু ফিরে চলল তার বাবার কাছে , তার মা'র কাছে। বাবা-মা কে প্রথমে চিনতেই পারেনি অপু।

অপু দুই হাতে তার মা'র চরণ ছুঁয়ে তাকে প্রণাম করল। ব্রজবাসী হঠাৎ চমকে উঠে বলল " কে ?" মিলি পাশেই ছিল বলল "মা, দিদিমণি তোমাকে প্রণাম করেছেন।"

ব্রজবাসী প্রাণ ভরে তাকে আশীর্বাদ দিল " ভাল থাক মা , খুব সুখে থাক, তোমার মঙ্গল হউক। আমি তো মা দীন দুখিনী, এক অভাগী, পাপের সাজা ভোগ করছি। তোমাকে কি আশীর্বাদ করব মা। চোখে আর তেমন দেখতে পাই না , তাই তোমাকে ও স্পষ্ট দেখতে পারছি না। তবু আশীর্বাদ করছি তুমি চিরদিন সুখে থাক মা, সুখে থাক।"

মা'র বুকের যন্ত্রণাটা যেন তীরের মত এসে অপুর বুকে লাগছিল। সে তেমনি মা'র সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মাকে দেখতে লাগল। ব্রজহরি মাটির দিকে তাকিয়ে বসেছিল

এমন সময় দুটি হাত এসে পায়ে ঠেকল। সে প্রথমে বুঝতে পারেনি কি হল। তাই সে তেমনি বসে রইল , যখন বুঝল ভীষণ চমকে উঠল। গত কয়েক যুগ ধরে এমন কেউ তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করেনি।

সে উপরের দিকে তাকাল কিন্তু চোখে সব ঝাপসা দেখতে লাগল। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল , ছলছল চোখে মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে একটু মাথা ঝুঁকিয়ে ভাল করে মেয়েটির চেহারা দেখার চেষ্টা করল। তার চোখের দিকে আরো গভীর ভাবে দেখার চেষ্টা করল। ধরধর করে ব্রজহরির চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে কাঁপা হাতে অপুর মাথায় শুধু হাত রাখল , কিছু বলার খুব চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। তার আবেগে , তার ভালবাসায় গলা এমন ভরে এল যে তার ঠোঁট দুটি কিছু বলার জন্য খুব কাঁপতে লাগল কিন্তু কোন শব্দ বের হল না।

অপু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। দ্রুত পায়ে সেখান থেকে চলে গেল। সোজা নিজের ঘরে। সেখানে বসে একা একা সে খুব কাঁদল। সে ভাবেনি বাবা-মা'কে এরকম ভাবে দেখবে। বাবা যে তাকে খুব চিনেছে তা বুঝতে বাকী নেই অপুর।

যথাসময়ে মহা-প্রসাদ গ্রহণের জন্য ডাক পরল মিলি তাদের। একজন চাকর সব সময়ই তাদের আগে পিছে ছিল তাদের দেখা শুনা করার জন্য। সেইই ঠিক করে দিল তারা কোথায় বসবে ? তাদের খাওয়া ঠিক ঠাক হচ্ছে কিনা? কিছু লাগবে কিনা ? সব সেইই দেখা শুনা করল। তাদের খাওয়া শেষ হলে সে ছুটে গিয়ে আবার দিদিমণিকে খবর দিল।

তাদের চলে যাবার সময় অপু মাথা নুইয়ে আবার বাবার সামনে এসে দাঁড়াল। তেমনি ধীরে বলল "মিলিকে রাখতে চাই। রাতে পৌঁছে দেব।" অতি উৎসাহে , আনন্দে তার

বাবা সজল নয়নে হেসে শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। অপু মিলির হাত ধরে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে লাগল বাবা, মা'র হাত ধরে মাকে সাথে নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছে।

মা-বাবা অনেক দূর চলে যেতেই অপু মিলিকে হঠাৎ একেবারে ঝাপটে জড়িয়ে ধরল। তার দুই গালে দুটি চুমু খেল। মিলি এসবের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারল না।

অপু মিলির হাত ধরে তাকে উপেনবাবুর কাছে নিয়ে গেল। উপেন আর বিমলা পাশাপাশিই বসেছিল।

অপুঃ দেখতো বাবা আমি কাকে নিয়ে এসেছি ?

উপেন আর বিমল ভাল করে তাকালেন , কিছুক্ষণ ভাবলেন, কিন্তু চিনতে পারলেন না। মাথা নেড়ে বললেন " নাঃ চিনতে পারলাম না তো।"

অপু তেমনি হাসি হেসে বলল "আমার ছোট বোন। ঈশানপুরের বাজারে প্রথম দেখা , ভাল লাগল তাই বোন বানিয়ে ফেললাম।"

মিলি মাথা নুইয়ে ছিল , অবাক চোখে এবার দিদিমণির দিকে তাকাল। প্রথমে এক-পলক ঝটকা খেয়ে উঠলেও বিমলা হা হা করে হেসে উঠল "বাঃ বাঃ তাহলে তো বেশ হয়েছে। এখন আমার দু-দুটি মেয়ে।"

উপেনবাবু পাশ থেকে বলে উঠলেন "ঠিক বলেছ , ঠিক বলেছ। চমৎকার হয়েছে। মা! তোমার নাম কি?"

মিলি কাছে গিয়ে উনাকে প্রণাম করতে করতে বলল " মিলি।"

উপেনঃ বাঃ। বেশ সুন্দর নাম। ভারি মিষ্টি নাম।

বিমলাকে প্রণাম করার পর বিমলা মিলির দু হাত ধরে উঠে দাঁড়াল , তার নাম-ধাম জিজ্ঞাস করল। তারপর তার কপালে একটা চুমু খেয়ে বলল " বেঁচে থাক মা, তোমরা দুজনেই সুখে শান্তিতে থাক। "

অপু মিলিকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল। বিশাল ঘর , এমন ঘর মিলি প্রথম দেখল। কত সুন্দর ঝক-ঝকে , সাজানো গোছানো। মিলি হা ঘরের চারিদিক দেখছিল। এমন সময় টক করে আলমারি খোলার শব্দে তার চমক ভাঙ্গল। বড় বড় চোখে সে দেখতে লাগল আলমারি সুন্দর সুন্দর জামা কাপড়ে ভরা। অপু মিলিকে কাছে টেনে বলল " যা-যা পছন্দ হয় নিয়ে নাও।"

মিলি যেন ঠিক বুঝতে পারল না। " কি?"

অপুঃ বলছি যা যা পছন্দ হচ্ছে নিয়ে নাও।

মিলির যেন ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। সে তেমনি হা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অপু হেসে বলল " আমি আদর করে তোমাকে দিচ্ছি।"

না মিলি কোন জিনিস নেয় নি। অপু বুঝল তার বোনটি যেমন তেমন নয়। খুব আত্ম-অভিমানী। জীবনের এই বয়সেই খালি পেট আর খালি হাত তাকে অনেক বাস্তব শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে।

তারা বাইরে এসে বসল। অপুর পাশের চেয়ারেই মিলি বসল। হঠাৎ মিলি বলল " দিদিমণি আমাকে কি কাজ করতে হবে ?"

অপু যেন একটু ঝটকা খেয়ে উঠল " মানে ?"

মিলিঃ না মানে, আমি তো লোকের বাড়িতে কাজ করি। তখন কিছু পয়সা পাই।

অপুর খুশির চোখে যেন হঠাৎ একটা দুখের বিজলী দৌড়ে গেল। অপুর আর কিছুই বুঝতে বাকী রইল না। সে কয়েক পলক তেমনি বসে কি যেন ভাবল তার পর বলল " ও হ্যাঁ , চল।"

দুজনে রান্নাঘরের কাছে গেল। বেশ কিছু লোক রান্না-বান্না করছে। অপু একজনকে ডেকে বলল " দেখ , যারা প্রসাদ গ্রহণ করতে বসবে মিলি সবাইকে জল দেবে। তাকে সব দেখিয়ে দাও।"

মিলি কাজে লেগে গেল , পিছন পিছন অপু ও। উপেন রায় আর বিমলা দেখলেন অপু আর মিলি সবাইকে জল দিচ্ছে , তারা ও খুশি হলেন। উপেন রায় আর বিমলা খুব ভাল জানেন তাদের অপু আর দশটা সাধারণ মেয়ের মত কখনোই নয়। তাই কখনোই তাকে কোন কাজে বাধা দেন নি।

ক্রমে দিন ফুরিয়ে গেল , সন্ধ্যা প্রায় নেমে এল। লোক যে যার বাড়িতে ফিরে যেতে লাগল। এবার মিলির ও ফিরে যাবার পালা। অপু মিলিকে নিজের ঘরে নিয়ে এল। আলমারি খুলে তিনটি ১০০ টাকার নোট বের করে মিলির দিকে হাত বাড়িয়ে বলল " ধর।"

মিলি অবাক চোখে দেখল তিনটি ১০০ টাকার নোট। এতো তাদের সারা মাসের খরচের টাকা।

মিলি সুর ধরে বলল " দিদিমণি !"

অপু একটু রাগত সুরে বলল " দেখ ভাই টাকাটা ধর। তা না হলে কিন্তু তোমাকে আর কাল থেকে কাছে ডাকব না। তোমার সাথে আর কোন কথা থাকবে না।" এই বলে সে টাকাগুলি মিলির হাতে গুজে দিয়ে বলল "কাল কখন আসবে ?"

মিলিঃ দিদিমণি আপনি যখন বলবেন ?

অপুঃ ভোরেই চলে এসে। দুজনে একটা নতুন কাজ করবো।

মিলি বেশ অবাক , বেশ খুশিতে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। যখন ঘরে পৌঁছল তুলসী তলাতে প্রদীপ জ্বালাবার সময় হয়ে গেল।

(৪র্থ পর্ব)

মিলির মনে আজ এক অপূর্ব আনন্দ, এক অচেনা খুশী। সে বাড়িতে ঢুকে দেখল বাবা ঘরের দাওয়ায় আনমনে বসে আছেন। না জানি কি খেয়ালে ডুবে গিয়ে মনে মনে মুচকি হাসছে। মিলি প্রথমে অবাকই হল যে, কেন বাবা এখনো নেশায় ঢুলে পড়েনি? কারণ এমন সময়ে বাবা বিনা নেশাতে থাকতে, সে কখনো দেখেছে কি না মনে পড়ে না। সে ডাক দিল "বাবা!"

তার ডাকে ব্রজহরির চমক ভাঙ্গল। সে যেন লাফিয়ে উঠল "মা, তুই এসেছিস। আয় আয় কাছে আয়। আমার পাশে বস। আর বল তোর দিদিমণির সাথে কি কি কথা হল ! তুই কি কি বললি। সে কি কি বলল?"

বাবার মুখে এমন কথা , মিলি যেন আকাশ থেকে পড়ল। সে বাবার পাশে বসে অনেক গল্প করল। শেষে বলল " দিদিমণি আরেকটি কথা বলেছে -"

ব্রজহরিঃ কি?

মিলিঃ দিদিমণি বলেছে যে তুমি যদি আর নেশা কর, মদ-গাজা খাও তবে দিদিমণি আর কখনো তোমার সাথে কথা বলবে না আর আমাকেও আর কাছে রাখবে না।

ব্রজহরি যেন ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল "দূর এই ছাই-ভস্ম কি কেউ খায়। আমি যে এখন আর মরতে চাই না। আমি বাঁচতে চাই, অনেক অনেক দিন বাঁচতে চাই।ওঃ, আজ যে আমার কত আনন্দ হচ্ছে, আজ যে আমার কত খুশির দিন। আমাদের সবার আনন্দের দিন। হে ভগবান, হে ঈশ্বর, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।"

মিলি ভীষণ অবাক হয়ে বলল " আজ খুশির দিন? আমাদের আনন্দের দিন? কেন বাবা?"

ব্রজহরি একবার মিলির চোখে চেয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে একটু হেসে বলল "তোর দিদিমণিটি কে, তুই চিনেছিস মা? তুই কি জানিস, তুই যাকে দিদিমণি বলে ডাকিস, সে কে?"

মিলি যেন মনে মনে একটু ধাক্কা খেল। বলল "তিনি তো রায় বাড়ির মেয়ে।"

ব্রজহরিঃ না রে না। তার আরেকটা পরিচয় আছে। গোপন পরিচয়, এ পরিচয়টা কেউ জানে না। তুই ও জানিস না মা। আমি জানি আর তোর দিদিমণি জানে। পরম শান্তিতে মুচকি হেসে ব্রজহরি বলল - তুই যাকে দিদিমণি বলে ডাকিস সে যে তোর আপন বড় বোন। আমার বড় মেয়ে, অপু।

যেন একটা ঝড় এক পলকেই মিলির দুই কানের পাশ দিয়ে বয়ে গেল। যেন একটা ভূমিকম্পে কাঁপতে লাগল মিলির দেহ মন। সে যেন বাবাকে বিশ্বাসই করতে পারল না। ঘরে শুয়ে ব্রজবাসী মন দিয়ে তাদের কথা শুনছিল, সে ধর-ফরিয়ে উঠে বসল।

মিলি বোবার মত হা-করে বাবার চোখের দিকে শুধু তাকিয়েই রইল। মুখে তার কোন কথা এল না। ব্রজহরি মেয়ের গালে আদর করে বলল “হ্যাঁ মা, সে তোর বড় বোন, অপু। তখন তার বয়স চার-পাঁচ, একদিন নদীতে জল আনতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম সে জলে ডুবে মরে গেছে। আজ তাকে আমি ফিরে পেলাম। বাপ-মায়ের চোখ নিজের ছেলে মেয়েকে চিনতে কি কভু ভুল করে মা? আর এটাও জেনে রাখ , সে তোকে খুব ভালই চিনতে পেরেছে।”

মিলি তেমনি হা হয়ে বসে রইল। তার সব হিসেব একে একে যেন মিলে যেতে লাগল। সেইই বাজারে হাতের তিলটা দেখে মিলির হাতটাকে খপ করে শক্ত করে ধরা। বাবার নামটা শুনে কেঁপে উঠা। ইচ্ছা করে সব ফুল অনেক দামে কিনে নেওয়া। পাশে বসিয়ে পেট ভরিয়ে চা-নাস্তা করানো। রায় বাড়িতে এত আদর আপ্যায়ন। সবার সামনে বুকে জড়িয়ে ধরা। নিজের ছোট বোন বলে উপেন রায়ের কাছে পরিচয় দেওয়া। আলমারি খুলে যা ইচ্ছে নিয়ে যেতে বলা। এত চাকর বাকর থাকতে ও মিলির সাথে সাথে সবাইকে জল পরিবেশন করা। আর সব শেষে এতগুলি টাকা মিলি হাতে গুজে দেওয়া। মিলি যেন তার সব উত্তর খুঁজে পেতে লাগল।

সে যেন পাথরের মত শুধু বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা বইতে লাগল। ব্রজহরি মেয়ে মাথাতে হাত রেখে বলল “কাঁদিস না মা, কাঁদিস না। আজ তো আমাদের খুশি দিন। আজ যে আমাদের আনন্দের দিন।”

মিলি দিদিমণির দেওয়া টাকাগুলি বাবার দিকে বাড়িয়ে দিল “দিদি দিল।”

টাকা গুলির দিকে তাকিয়ে ব্রজহরি হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল “আমি জানতাম, আমি জানতাম। সে আমার মা। সে আমার হারিয়ে যাওয়া অপু।” টাকা গুলি নিয়ে ব্রজহরি পাগলের মত মাথায় ঠেকাতে লাগল।

ঘরে ব্রজবাসীর বুকেও ঝড় বয়ে যেতে লাগল। সে সব কথা কান পেতে শুনছিল। মনে মনে শুধু জপতে লাগল “আমাকে ক্ষমা করে দে মা। আমাকে ক্ষমা করে দে।”

পরদিন ভোর বেলাতে মিলির ঘুম থেকে উঠার আগেই ব্রজহরি স্নান সেরে তৈরী। মিলি ঘুম থেকে উঠে বাবাকে এমন দেখে একটু চমকে বলল “এত সকাল সকাল কোথায় যাবে বাবা?”

ব্রজহরিঃ মা, আজ থেকে আমি কাজে বের হব। আমি কাজ করব। যে কাজ পাব, সেইই কাজই করব। আর আমি ঘরে বসে থাকব না।

মিলি বেশ অবাক হল তবে বাধা দিল না। উৎসাহ দিয়ে বলল “ঠিক আছে বাবা যাও, তবে সাবধানে কাজ করো। বয়স তো হয়েছে , তাইই।”

ব্রজহরি কি যেন একটু ভেবে মিলির পাশে এসে বসল, বলল “মা, তোকে একটা কথা বলব। কথাটা মনে রাখিস। তুই তোর দিদিমণিকে বলিস না যে তুই তাকে চিনতে পেরেছিস?”

মিলিঃ কেন বাবা?

ব্রজহরিঃ উপেনবাবুর সম্মানের দিকে চেয়েই আমার অপু সব জেনে শুনেও চুপ রয়েছে। সঠিক সময়ে সেইই সব খুলে বলবে।

মিলিঃ এমনটা কেন বাবা?

ব্রজহরিঃ যেদিন আমাদের খারাপ সময় ছিল সেদিন কেউ কাছে এল না। উপেনবাবু হয়তো না জেনেই আমার উপকার করেছেন। কিন্তু এখন লোক বলতে পারে ব্রজহরির মেয়েকে উপেন রায় চুরি করেছিল। সেদিন যদি অপু নদীতে পড়ে মরে যেত তবে কেউ ফিরেও তাকাত না। কিন্তু আজ অনেকেই উপেনবাবুর কথার বিশ্বাস করবে না। আর সত্যি বলতে, আমিও তো জানিনা উপেনবাবু কিভাবে অপুকে পেল। তাই তুই দিদির কাছে অচেনাই থাকিস মা। আমার অপুই সময়ে সব ঠিক করবে।

মিলির কাছে কথাটা সঠিক লাগল সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

ব্রজহরি রুগ্ন পায়ে, গামছা কাঁধে, ধীর পারে কাজের খোঁজে বাজারেই দিকে পা বাড়াল। ব্রজহরি বেড়িয়ে যেতেই ব্রজবাসী মিলিকে কাছে ডাকল। বলল "মা, তুই কি একটা কাজ করবি আমার জন্য।"

মিলিঃ কি কাজ মা?

ব্রজবাসী মাথা নিচু করে বলল "যখন আবার তোর দিদি সাথে দেখা হবে, আমার হয়ে তার দুটি পা ছুঁয়ে তাকে প্রণাম করিস মা।"

মিলি মাকে জড়িয়ে ধরে বলল "এ কি তুমি বলছ মা?"

সজল নয়নে ব্রজবাসী বলল "আমার বেদনা তুই বুঝবি না মা।" এই বলে সে পুরানো সব ইতিহাস মিলিকে খুলে বলতে লাগল। কিভাবে ব্রজহরির প্রথম বৌ মারা গেল? কোথায় তাকে নদীতে ভাসান হল? এই শিশু অপুর উপর ব্রসবাসী কিভাবে কত যাতনা দিয়েছে? কেন সেদিন অপু জলের ঘাটে জল আনতে গিয়েছিল আর তখন কি হয়ে থাকতে পারে?

ব্রজবাসী আজ আর কিছুই লুকিয়ে রাখল না। সব জেনে মিলি যেন লাজে, দুঃখে, অপমানে, যন্ত্রণায় পাথরের মতই হয়ে গেল। দিদিকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ তার মনে গত রাত থেকে যা ছিল, সব মা'র কথা শুনে উড়ে গেল। দিদির চোখে আজ সে কিভাবে চোখ রাখবে? মিলি তেমনিই বসে রইল। অনেক বেলা হয়ে গেল সে তেমনি বসে রইল।

ধীরে ধীরে যখন তার মনের ভাব একটু হাল্কা হল সে এক তীব্র টান অনুভব করল দিদির জন্য। সে তার চারিদিকে যেন দিদির শব্দ শুনতে পেল। সে পরি কি মরি হয়ে স্নানাদি সেরে রায় বাড়ির পানে ছুটল। আজ সে দিদিমণির সাথে দেখা করতে যাচ্ছে না, আজ সে নিজের দিদির সাথে দেখা করতে যাচ্ছে। খুশিতে নিজের খেয়ালেই সে গ্রামের মাটির পথে চলতে লাগল। আর হঠাৎ তার চমক ভাঙ্গল। অপু হেঁটে হেঁটে এদিকেই আসছে, পিছন পিছন নন্দু।

দূর থেকে তার চোখে আজ দিদিকে ঠিক চাঁদ মনে হচ্ছে। নিজের জীবনের চাঁদ। সে এক নতুন চোখে দিদির দিকে তাকিয়ে রইল। দূর থেকে প্রাণ ভরে দেখতে লাগল তার দিদিকে। অপু প্রাণ খোলা হাসি হাসে সমনে এসে দাঁড়াল "অনেক বেলা হল আর তুমি এলে না। তাই আমি নিজেই চলে এসেছি।"

মিলি দিদিকে কি বলবে শব্দ খুঁজে পেল না। হঠাৎ বলল "তুমি এত গুলি টাকা দিলে তাই আমরা এই ক'দিন হয়তো পেট ভরে খেতে পারব। এর জন্য তোমাকে একটা প্রণাম করবো , তুমি কিন্তু মানা করতে পারবে না।" বলেই সে দিদির দু'পা ধরে দিদির চরণে যেন নিজের দুঃখ, আবেগ, মনের সব জ্বালা-যন্ত্রণা সব সপে দিল।

অপু ছলছল চোখে মিলিকে বুকে জড়িয়ে ধরল, বলল " হয়েছে, হয়েছে। আর এত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে না। চল ঐ নদীটার কাছে একটু ঘুরে তবে বাড়ীতে যাব।" এই বলে অপু মিলি কাঁধে হাত রেখে নিজের বোনকে সাথে নিয়ে মা'র দিকে পা বাড়াল।

আজ মিলি সব জানে, তার দিদিকেও চিনে। সে মনে মনে আগেই জানে দিদি নদীর কোন জায়গাটায় যাবে? কেন যাবে? মা নদীর যে জায়গাটার কথা আজ সকালে বলেছিল সেখানেই এসে দিদি নদীর পারে দাঁড়াল।

অপু যেন খুব ভাবুক হয়ে তার মা'র পানে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে আনমনা হয়ে একটা ছোট্ট শিশুর মত নদীর জলে হাত রেখে খেলা করতে লাগল। মিলির মনে হল এইতো সে দিনের ছোট্ট অপু।

অপু কয়েকবার নদীর জল মাথায় রাখল, চোখে রাখল। তারপর চকচক চোখে মিলির দিকে তাকিয়ে বলল " মিলি এখানে আসো। নদীতো আমাদের মা। মা'কে একবার প্রণাম করবে?"

মিলির কিছুই বুঝতে বাকী নেই। সে দিদির কথা মতই তার বড়মাকে প্রণাম করল। আজ তার চোখেও যেন এই নদীটা তার বড়মা হয়ে গেল। অপু মিলিকে পাশে রেখে তার মাকে লক্ষ্য করে বলল "মা, এই দেখ আমার ছোটবোন মিলি। আশীর্বাদ করো যেন আমরা সব সময় এক সাথে থাকি।"

কেউ কিছু বুঝুক না বুঝুক, মিলি ঠিক বুঝল দিদি কাকে কি বলছে? কার সম্পর্কে বলছে আর কেন বলছে?

সে আবেগে তার দিদিকে প্রথমবার আপ্রাণ জড়িয়ে ধরল। অপু ও তাকে জড়িয়ে ধরল। মা'র স্নেহের ছায়ায় দুবোন একে অপরকে জড়িয়ে ধরে তেমনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কেউ কাউকে ছাড়তে চাইল না। চেনা হয়েও দুজনই অচেনা থাকতে চাইল।

মা'র কাছ থেকে দুজনের ফিরে আসার সময় মিলি বলল "দিদিমণি কাছেই আমাদের বাড়ি। যাবেন?"

অপু এক গাল হেসে বলল "যাব, তবে আজ নয়। ওটা আমার ছোট বোনের বাড়ি বলে কথা। বেশ সময় হাতে নিয়ে যেতে হবে। বেশ পাকাপোক্ত ভাবে যেতে হবে।"

দিদির কথার মানে মিলি যেন দিদির চেয়েও ভাল বুঝল।

অপু নন্দুকে বলল "নন্দু আমারা ধীরে ধীরে আসছি। তুমি একটু জলদি যাও। গিয়ে ফাল্গুনীকে বলবে আমাদের জন্য খাবার তৈরী রাখতে। আমরা এসেই খেতে বসে যাব। বড্ড খিদে পেয়েছে।"

নন্দু দ্রুত চলতে শুরু করল।

মিলি খেতে বসতে একটু আমতা-আমতা করছিল। কিন্তু অপু কোন কথাই শুনল না। উপেন রায় আর বিমলা তাদের অপেক্ষায়ই খাবার টেবিলে বসেছিল। অপুর তাগিদে মিলি হাত, মুখ ধুয়ে খেতে বসল। সে খেতে বসে খাবারের দিকে তাকিয়েই রইল। ছবিতেও সে কখনো এমন খাবার দেখেনি। সে ভেবে পাচ্ছিল না এখন তাকে কি করতে হবে।

অপু তার মনের অবস্থা ঠিক বুঝল। সেইই মিলিকে বলে দিতে লাগল কিভাবে শুরু করবে।

(৫ম পর্ব)

খাওয়া শেষ হলে অপু মিলিকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। দুই বোন নানান গল্প করতে লাগল। অপু লক্ষ্য করল মিলি হঠাৎ হঠাৎ যেন কেমন উদাস উদাস হয়ে যাচ্ছে। শেষে সে মিলিকে জিজ্ঞেস করল "কি হল মিলি হঠাৎ হঠাৎ তুমি যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছ? কেমন যেন অন্য মনস্ক হয়ে যাচ্ছ? কি ব্যাপার?"

মিলি একটু আমতা আমতা করছিল শেষ সত্যি কথাটাই বলল "দিদিমণি, অনেকদিন পরে আজ বাবা কাজে বের হয়েছে। এই রুগ্ন শরীরে ক্ষেতে-খামারে কাজ করতে গিয়ে বাবার যদি কোন বিপদ ঘটে তাইই মনটা বাবার কথা ভেবে একটু খারাপ লাগছিল।"

অপু হা-হা করে হেসে বলল "আরে সে নিয়ে কিছু ভাবতে হবে না তোমার। তোমার বাবা আমাদের এখানেই কাজ করছে। ক্ষেতে কাজের লোকের দরকার তাই আমার বাবার কথায় সকালে নন্দু গিয়ে বাজার থেকে কিছু কাজের লোককে ডেকে আনল। তোমার বাবা ও এলেন। উনাকে ও কাজ দেওয়া হল। এখন রোজই তিনি এখানে কাজ করতে পারবেন।"

মিলি বেশ অবাক হয়ে বলল "কি কাজ?"

অপুঃ ঐ যে, উনাকে শুধু হেটে হেটে দেখতে হবে যে আমাদের ক্ষেতের আল গুলি ঠিক ঠাক আছে কি না? কোন ক্ষেতের ফসল পেকেছে? কোন ক্ষেতে পাখীদের তাড়াতে কাক-তাড়ুয়া লাগাতে হবে? ব্যাস এই- টুকুই।

মিলি হঠাৎ আনন্দে, খুশিতে বুব-বুব করে হেসে উঠল। তার উদাস চোখ খুশিতে ছলছল করে উঠল। সে বলল "এটা কি আবার কোন কাজ হল?"

অপুঃ দেখ ভাই, এটাই তো আমার কাছে অনেক বড় কাজ। আমি তো আর নিজে এ কাজটা করতে পারতাম না।

মিলি চকচক চোখে বলল "দেখ কাণ্ড, বাবা এখানে সবুজ ক্ষেতে হেটে বেড়াচ্ছেন আর আমি খালি-পিলি চিন্তা করে মরছিলাম। তা কাল বাবাকে কি কাজ করতে হবে?"

অপুঃ বেশ কিছুদিন হয়তো এই কাজটাই চলবে। তারপর ভাবছি আমাদের নারকেল গাছগুলিতে যে যে গাছে নারকেল পেকেছে সেই সেই গাছে একটা দাগ দিয়ে রাখার একটা কাজ উনাকে দেব।

মিলি হা-হা করে হেসে উঠল। মিলিকে হাসতে দেখে অপুও হেসে উঠল। দুজনের হাসি থামতে কিছু সময় লাগল।

দিন গড়িয়ে বিকেল হল। মাঠে যারা কাজ করছিল তারা কাজ সেরে ফিরে এল। সবাই রায় বাড়ির বারান্দাতে বসল মজুরি নিতে। ব্রজহরি মাথা নিচু করেই বসেছিল তবে বেশ খুশি, আর মিটি-মিটি হাসছিল। নন্দু এসে সবাইকে যার যার পাওনা দিয়ে দিল। শুধু ব্রজহরিকে বলল "আপনার টাকা আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে।" ব্রজহরি কোন কথা বলল না শুধু খুশি মনে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। সে মনে মনে জানে কার হাতে টাকা আসবে। সবাই বাড়ির পথে পা বাড়াল।

সবাই চলে যাবার পর অপু মিলির হাতে এটা ১০০টাকার নোট দিয়ে বলল নাও তোমার বাবার আজকের কাজের দাম।

মিলি আজ তেমন চমকে যায় নি, সে জানে এটা কেন দেওয়া হচ্ছে। সে বলল "দিদিমণি ২০ টাকাতেই তো দিনমজুর পাওয়া যায়!"

অপু হঠাৎ একটু ঝাঁঝিয়ে উঠে, ধমকে উঠল "দিনমজুর আর তিনি কি এক হলেন?" খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে অপু আবার বলল "মানে, তোমার বাবা বলে কথা। আমার ছোট বোনের বাবা। তিনি তো আর যেমন তেমন না।" মিলি দিদির এই রাগ দেখে মনে মনে ফিক-ফিক হেসে উঠল।

দিদিমণির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মিলি বাড়ির পথে পা বাড়াল। পথেই সে বাবার নাগাল পেল, দেখল বাবা ধীর পায়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছে। দৌড়ে সে বাবাকে গিয়ে ধরল। দুজনেই খুশিতে পথ চলতে লাগল। মিলি বলল "জান বাবা, দিদি তোমাকে ১০০টাকা দিল।"

ব্রজহরিঃ কত টাকা দিল সেটা জানি না মা। শুধু বুঝেছিলাম তুইই টাকাটা নিয়ে আসবি। তুই আর আমার অপু, তোরা দুজনেই বেঁচে থাক মা। তোরা চিরদিন সুখে থাক।

মিলিঃ তুমি কাজ করতে বের হলে আমার মনে মনে খুব কষ্ট হল বাবা।

ব্রজহরি হেসে বলল "দূর পাগলি, তুই কি জানিস আমি আজ সারাদিন কি কি কাজ করলাম? এটা কি কোন কাজ হল? তাছাড়া আমি সারাদিন আমার অপু মার কাছাকাছি ছিলাম এটাতেই আমার বেশ আনন্দ হচ্ছিল।"

মিলিঃ জানি বাবা, তুমি কি কাজ করেছ দিদি আমাকে সব বলল। তবু যেন আমার মন সেটা মানতে পারছে না।

ব্রজহরি বেশ ভিজা গলায় বলল "তুই আর আমাকে বাধা দিস না মা। তুই জানিস না, আজ আমি কত খুশি। আমার বুকে কি আগুন জ্বলছিল তা তুই বুঝতে পারবি না মা। যত বার দূর থেকে আমি আমার অপু মাকে দেখি ততই যেন আমার প্রাণটা আনন্দে ভরে উঠে। আমি খুব শান্তি পাই। আমার বুকের জ্বালাটা একটু কমে। তুই আর মানা করিস না মা।"

মিলি কিছুই উওর দিল না। শুধু বাবার হাত ধরে বাবার সাথে বাড়ির পথে পা বাড়াল।

(৬ষ্ঠ পর্ব)

মিলি আর তার বাবা ঐ সাঁঝের আলোতে গ্রামের মাটির পথ দিয়ে বাড়ির পথে হাটতে লাগল। কিন্তু তারা বুঝল না ঐ দূরে পেছন থেকে অপুর দুটি চোখ সবার আড়ালে তৃপ্তির অপলক চাহনিতে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। অনেকক্ষণ, যতক্ষণ না তারা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। তারপর সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের ঘরে চলে গেল। মনে মনে গভীর ভাবে সে কি যেন ভাবল।

পরদিন মিলি আর ব্রজহরি এক সাথেই রায় বাড়িতে যাবার জন্য ঘর থেকে বের হল। ঘর থেকে বের হতেই সামনে নন্দু হাজির। সে হেসে বলল "দিদিমণি মিলিকে ডেকে

পাঠিয়েছেন। তাইই খবর দিতে এলাম। দিদিমণি ঐ বাজারে মিলির জন্য অপেক্ষা করছেন।"

ব্রজহরি মিলির মাথাতে হাত রেখে বললেন "যা মা, তোর দিদিমণি তোকে ডাকছেন।"

"এই সকাল সকাল দিদি বাজারে কেন এল?" এই ভাবতে ভাবতে মিলি বাজারের পথে এগিয়ে গেল। ব্রজহরি উল্টা দিকে রায় বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

ছোট বাজার, খুব বেশী দোকান-পাট নেই। তবে সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস প্রায় সবই পাওয়া যায়। মিলে দেখল দিদি সেই চায়ের দোকানের সামনে বসে আছে। দূর থেকে মিলিকে দেখে অপু এগিয়ে এল। কাছে এসে মিলিকে জড়িয়ে ধরে গালে একটু চুমু খেয়ে বলল "চল, আগে কিছু টিফিন করি তার পর বাকী কাজ।" দুই বোন আর নন্দু মিলে চা-সিঙ্গেরা খেল। মিলি জিজ্ঞাস করল "দিদিমণি! এত সকাল সকাল বাজারে চলে এলেন যে, কোন বিশেষ কাজ আছে কিছু?"

অপু একটু উৎসাহে, একটু উদাস সুরে বলল "হ্যাঁ, মস্ত একটা কাজ আছে। আর কাজটা তোমাকেই করতে হবে। কাল-।" অপু কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। সে যে কাল শহরে চলে যাচ্ছে কথাটা মিলির কাছে গোপন করে গেল। কথা ঘুরিয়ে সে বলল "কাল না , আজই শুভ সময়। তাই আমি আজই একটা কাজ শুরু করতে চাই।"

মিলিঃ কি কাজ?

অপুঃ দেখলেই বুঝতে পারবে।

বাজারের সব দোকান ততক্ষণে খুলে গেছে। নন্দু দোকানের টাকা মিটিয়ে দিয়ে এলে, অপু মিলির হাত ধরে এক বইয়ের দোকানের দিকে এগিয়ে গেল। রায় বাড়ির দিদিমণিকে

আসতে দেখে দোকানদার তাড়াতাড়ি হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল। “দিদিমণি কি কি লাগবে বলুন?”

অপু এক গাল হেসে বলল “আমাকে লেখার জন্য একটা খাতা আর কাঠ-পেন্সিল দিন। সাথে প্রথম শ্রেণী আর দ্বিতীয় শ্রেণীর সব বই ও লাগবে। আর একটা বই রাখার ব্যাগ।”

নন্দু আর মিলি দুজনেই বেশ অবাক হল। এত সব বই-পত্র আবার কার জন্য। এগুলি পড়ার মত কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না।

অপু সব কিছুর দাম মিটিয়ে দিল। দোকানদার সব বই-পত্র বইয়ের ব্যাগের ভীতরে ঠিক-ঠাক করে গুছিয়ে দিল। নন্দু এগিয়ে এসে ব্যাগটা নিতে গেলে অপু বারণ করল “না নন্দু থাক, ওটা আমিই নিয়ে যাব।” নন্দু বিশেষ কিছু না বলে পিছিয়ে গেল। কারণ সে খুব ভাল ভাবে দিদিমণিকে চিনে। এই ব্যাগের গুরুত্ব দিদিমণির কাছে খুব বেশী। অপু ব্যাগ হাতে খুব খুশি। মিলি কয়েক বার দিদিমণিকে জিজ্ঞাস করল “দিদিমণি এ গুলি কে পড়াশুনা করবে?” অপু শুধু রহস্যর হাসি হেসে মিলির প্রশ্নকে এড়িয়ে গেল। বই ব্যাগ হাতে তারা রায় বাড়ির দিকে রওনা দিল।

বাড়িতে এসে অপু মিলির হাত ধরে সোজা নিজের ঘরে। নিজের ঘরে ডুকে অপু মিলিকে আয়নার সামনে দাঁড় করাল, মিলি কাঁধে বই এর ব্যাগটা ঝুলিয়ে দিয়ে বলল “দেখিতো তোমাকে এবার কেমন লাগছে দেখতে?”

মিলিও দিদির কথাতে, পুতুলের মতই ঘুরে ফিরে আয়নাতে নিজেকে দেখতে লাগল।

অপুঃ বইয়ের ব্যাগ কাঁধে কেমন লাগছে নিজেকে?

মিলিঃ খুব ভাল লাগছে। বেশ মজা লাগছে। আচ্ছা দিদিমণি এই বই গুলি কার?

অপু হেসে বলল “সব গুলি তোমার।”

মিলি যেন কিছু বুঝতে পারল না, নাকি কিছু শুনতে পারল না তাই কান খাড়া করে বলল “না মানে এই বই গুলি কার জন্যে আনলেন? কে পড়বে বই গুলি?”

অপু হাসতে হাসতে বলল “আরে বাবা বললামই তো, বই গুলি সব তোমার আর তুমিই বই গুলি পড়বে। আজ থেকেই তোমার পড়াশুনা শুরু।”

মিলি যেন আজ আবার আকাশ থেকে পড়ল “আমার! আমি পড়ব এই বই গুলি!”

অপুঃ হ্যাঁ, তুমি পড়বে। এতে অবাক হবার কি আছে?

মিলিঃ না মানে। আমি কি ... মানে... বলছিলাম।

অপু বেশ রসিকতা করে করে বলল “ঘাবড়ে যাবার কিছুই নেই। তোমাকে তো আর আমি এমনি ছেড়ে দিতে পারি না। একবার যখন হাতে পেয়েছি তো বেশ করে রং মাখিয়ে , সং সাজিয়ে তবে ছাড়ব।” এই বলে অপু মিলিকে জড়িয়ে ধরে বলল “পড়াশুনা হল জীবনের সূর্য। এই সূর্য না উদয় হলে যে সারা জীবন রাতের আধারে থাকতে হবে। আর আমি কি তোমাকে কখনো এই আধারে একা ছাড়তে পারি?” অপু গভীর ভাবে ছোট বোনকে জড়িয়ে ধরল।

শুরু হয়ে গেল মিলির পড়াশুনা, এক নতুন জীবনের শুভ সূচনা। অপু মিলিকে অ-আ, ক-খ, ১-২ সব দেখিয়ে দিল।

দিদির কথামত, এক শিশুর মত মিলিও বইপত্র নিয়ে বসে সুর ধরে অ-আ শিখতে লাগল।

"অপুর ঘরে কে এমন করে সুর ধরে পড়ছে?" তা দেখতে এসে বিমলা আর উপেন রায় ঘরে ডুকে দেখলেন অপু দিদিমণি আর মিলি ছাত্রী।

বিমলা আর উপেন রায় দিদিমণি আর ছাত্রীকে দেখে খুব হাসতে লাগলেন। বললেন "খুব মানিয়েছে দুজনকে।"

অপু মা'র গলা জড়িয়ে ধরে বলল "মা, তোমরা হাসলে কিন্তু আমরা বেশ লজ্জা পাব।" বিমলা মেয়ের গালে খুব করে দুটি চুমু দিয়ে বললেন "আমার মেয়ে যা করতে পারে তা খুব কম লোকে করতে পারে।

এ তো তুই খুব ভাল কাজ করছিস মা। ক'জন এমন ভাবে ভাবতে পারে, আর এমন কাজ করতে পারে। আমরা তো হাসছি অন্য কারণে। মনে হচ্ছে আমরা যেন আজ আবার সেই ছোট্ট অপুকে দেখছি।

ছোট বেলায় তুই এমনি করে তোর বাবাকে সামনে বসিয়ে রাখতি, এমনি করে তুই দিদিমণি সাজতি আর এমনি করে তোর বাবাকে অ-আ শিখাতি। সেই কথাগুলি মনে করেই আমরা হাসছিলাম। আজ মনে হল আবার আমরা সেই অপুকে ঘরে ফিরে পেলাম।"

মা'র কথাতে অপু খুব লজ্জা পেয়ে মা'কে জড়িয়ে ধরে মার আঁচলে মুখ লুকাল। উপেন রায় হাসতে হাসতে বললেন "তুই তো মা আমাদের গর্ব। আমরা জানি তুই আর দশ জনের মত সাধারণ মেয়ে না। ভাল, ভাল খুব ভাল। চালিয়ে যা মা। যে কাজ করছিস সেটা চালিয়ে যা। আর চেষ্টা করবি এর থেকেও বড় কাজ করতে। আমরা তোর পিছনেই আছি। আমার মেয়ে, আমার অপু কখনোই হার মানতে পারে না।"

বাবার কথাতে অপুর মাথায় হঠাৎ কি যেন একটা বিচার এল। সে বীর-দর্পে বাবাকে জবাব দিল "তাই হবে বাবা। তাই হবে।" হাসাহাসি করে বিমলা আর উপেন রায় ঘর থেকে চলে যেতেই আবার মিলির পড়াশুনা শুরু হয়ে গেল।

(৭ম পর্ব)

অপুর ঘরে মিলির পড়া শুনা চলছে। মিলি অনেক চেষ্টা করে একাগ্রতার সাথে পড়তে লাগল হঠাৎ তার মনে হল দিদি যেন চুপ চাপ অপলকে তার দিকে চেয়ে আছে। সে ফট্ করে ঘাড় ঘুরিয়ে দিদির পানে চাইল। দেখল দিদি সত্যি ছলছল চোখে অপলকে তার পানে চেয়ে আছে। মিলি যেন একটু ঘাবড়ে গেল। সে বলল "কি হয়েছে দিদিমণি? এমন ভাবে চেয়ে রইলে যে?"

অপু এক গাল হেসে বলল "তোমাকেই দেখছি আর আমার ছেলেবেলার কিছু কথা ভাবছি। দেখতে দেখতে ছেলেবেলাটা চলে গেল।" মিলি একটু উৎসাহ দেখিয়ে বলল "আমাকে কি কিছু বলবে তোমার ছেলেবেলার কথা?" অপু একটু উদাস হেসে বলল "সে অনেক কথা। আজ নয় নাই শুনলে। তবে আমি ভাবছিলাম কিছু হিসাব-নিকাশের কথা। এই যেমন ধর তোমার সাথে আমার প্রথম দেখা, তোমাকে ভালবেসে ফেলা। এই ঈশানপুরে আমার আসা। সবই যেন একটা হিসাবের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। মনে কর যদি তোমার সাথে আমার দেখাই না হত? তখন?"

মিলির বুকটা ধুক ধুক করছিল। সে কোন উওর খোঁজে পেল না। ঘরে যেন হঠাৎ এক শত যুগের নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। এই কথার উওর মিলি যেমন পেল না, অপু ও খোঁজে

পেল না। অপুর চোখের কোনা একটু ভিজে গেল। সে উঠে জানালার পাশে চলে গেল। ঐ তো দেখা যাচ্ছে বাবা খেতের আলে আলে ধীর পায়ে হাঁটছে।

মিলি মাথা নিচু করে সেখানে তেমনি বসে রইল। সে ভাবতে লাগল দিদির সাথে যদি সেদিন না দেখা হত, দিদি যদি তাকে সেদিন নাইই চিনতো তবে জীবনটা তেমনি অন্ধকারেই দুখে, কষ্ট হারিয়ে যেত। আজ বুকে যে "দিদি দিদি" শব্দটা খুশিতে উড়ে বেড়ায় সেই খুশি আর থাকত না। বাবা তেমনি মাতাল হয়ে, বেহুঁশ হয়েই একদিন চলে যেতেন। আর অন্ধ মা এখানে ওখানে ভিক্ষা করে জীবন কাটাতেন, নইলে না খেতে পেরেই মরে যেতেন।

মার কথা, বাবার কথা ভেবে ভেবে মিলির খুব কান্না পেল, সে তেমনি মাথা নিচু করেই কাঁদতে লাগল। অপুও ওদিকে জানালায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। ছোট বোনকে কাঁদতে দেখে নিজেকে ধীরে ধীরে সামলাল।

মিলির কাছে এসে বলল "দেখ মিলি, কাল আমি হয়তো থাকব না, মা বাবাও একদিন থাকবে না। এই জীবন পথে সবাইকে একাই চলতে হয়। আর তাই নিজেকে সেই মত স্বাবলম্বী এবং যোগ্য করতে হয়। অনেক কিছু জানতে হয়, শিখতে হয়। একমাত্র শিক্ষাই পারে আমাদের সকল অন্ধকার থেকে দূর করতে। আজ তোমাকে যে বই গুলি দিলাম মনে রাখবে এই বই গুলি তোমার জীবনের হাতিয়ার, তোমার জীবনে ভীত। কখনো পড়াশুনা থেকে দূর হইয়ো না। এটাই মুক্তির এক মাত্র পথ।"

পৃথিবীর এটাই একটা চরম সত্য যে সব কিছুই এখানে পরিবর্তনশীল। ঘরের সেই ভারী পরিবেশে হঠাৎ হুড়-মুড়িয়ে একটা কাজের লোক প্রবেশ করল, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে বলল "দিদিমণি, দিদিমণি, বাড়িতে অনেক পুলিশ এসেছে। মেয়ে পুলিশ ও আছে।"

অপু আশ্চর্য হয়ে বলল "পুলিশ? সে আবার কি কারণ?"

ঘরের হাওয়াটা হঠাৎ অন্য পরিবেশে বদলে গেল। মিলি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, কারণ সে পুলিশকে ভীষণ ভয় পায়। সে ঝটপট উঠে দিদির পিছনে লুকিয়ে গেল। মিলি আর সেই চাকরকে এত ভয় পেতে দেখে অপু বলল "আরে এ কি হল? তোমরা এত ভয় পাচ্ছ কেন? পুলিশ কি বাঘ যে আমাদের খেয়ে নেবে? দাঁড়াও আমি দেখছি।"

অপু দ্রুত পায়ে বাইরে বেড়িয়ে গেল। মিলি আর সেই চাকর লুকিয়ে লুকিয়ে, উঁকি মেরে জানালা দিয়ে দেখতে লাগল "ব্যাপারটা কি?"

সত্যি বাইরে অনেক পুলিশ, মেয়ে পুলিশ ও আছে। আর রায় বাড়িতে পুলিশ এসেছে দেখে গ্রামের কিছু লোক দূর থেকে এখানে ওখানে জমা হয়ে দেখতে লাগল ঘটনাটা। অপু আরো কাছে যেতেই দেখল আরে এ যে তার প্রিয় বান্ধবী ডি.এস.পি. পিয়ালী। পিয়ালীকে দেখেই অপু খুব অবাক চোখে হেসে উঠল "আরে তুই এখানে? আমি তো জন্মেও কখনো ভাবিনি এখানে তোকে এই ভাবে দেখব।" দুই বান্ধবী একে অপরকে জড়িয়ে ধরল।

পিয়ালী হাসতে হাসতে বলল "আরে কিছুদিন হল আমি এখানেই বদলি হয়ে এসেছি। এ দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম ঘরের দরজা খোলা। তোদেরই হয়তো কাজের লোক হবে, তাকে জিজ্ঞাস করলাম তোরা আছিস কি না? ব্যাস।"

অপু পিয়ালীর হাত ধরে টানতে টানতে বলল "চল চল ঘরে চল। বাবা-মা দুজনই এখন এখানে আছেন।"

পিয়ালী অপু সাথে ঘরে চলল। বাকী পুলিশরা ও পিছনে পিছনে চলল। বসার ঘরে সবাই বসল। উপেন রায় আর বিমলা ও খবর পেয়ে এল। পিয়ালীকে এখানে দেখে স্বাভাবিক ভাবেই খুব অবাক ও হলেন। পিয়ালী তার জেঠু-জেঠীমনিকে প্রণাম করল। কিছুক্ষণের

মধ্যেই সবার জন্য জল খাবার এসে গেল। অপু পিয়ালীকে বলল "চল তুই আমার ঘরে বসে খাবি।" বাকীদের ওখানে বসতে বলে পিয়ালী অপুর সাথে অপুর ঘরে গিয়ে উঠল।

মিলি কি যেন একটা কি করছিল হঠাৎ পুলিশকে একেবারে নাকের সামনে দেখে সে আঁতকে উঠল। মিলিকে ও ঘরে একা দেখে পিয়ালীও বেশ অবাক হল। মিলি ভয়ে লাল হয়ে সুড়সুড় করে দিদি পিছনে চলে গেল। অপু হাসতে হাসতে বলল "আরে এ আমার প্রিয় বান্ধবী। পিয়ালী। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের এক সাথে পড়া শুনা, একসাথে খেলাধুলা। ও এখন পুলিশের বড় অফিসার। এদিক দিয়ে যাচ্ছিল তাই দেখা করতে এল।"

অপু পিয়ালীর দিকে তাকিয়ে বলল "এই দেখ পিয়ালী, আমার ছোট বোন মিলি। এই গ্রামেই তাকে দু দিন হল আমি খোঁজে পেয়েছি। যেমন তার রূপ তেমনি সে ভীতু।" অপু আর পিয়ালী হা হা করে হেসে উঠল। মিলি কাঁপা কণ্ঠে বলল, "দিদিমণি আমি এবার যাই?"

অপু কিছু বলার আগেই পিয়ালী এক ঝটকার তার হাত ধরে বলল "যাই মানে কোথায় যাই? পুলিশ একবার কাউকে ধরলে তাকে কি সহজে ছাড়ে। আর তুমি যখন আমার অপুর ছোট বোন, তখন তো আমারও ছোট বোন। তোমাকে তো আর ছাড়ছি না। আমাদের সাথেই তো তোমার বসতে হবে, জলপান করতে হবে।"

মিলির মুখটা যেন কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। তাই দেখে পিয়ালী আর অপু বেশ মজা পাচ্ছিল। অপু বলল "দূর পাগলি। ও তো আমারই মত তোমার বড় বোন। তাকে কি ভয় পেতে আছে? আর সে এখন ঈশানপুরেই থাকবে। আপদে বিপদে তুমি তার কাছে যেতে পারবে। সে তো আরো ভাল কথা। আনন্দের কথা।"

অপু তার কথা শেষ ও করতে পারেনি, পিয়ালী মিলিকে এক টানে নিজের কুলে তুলে নিলো। বলল "বড় বোনকে আবার কিসের ভয়? বড় বোনের সাথে আবার কিসের লজ্জা?" অপু পিয়ালীর এই কাণ্ড দেখে অট্টহাসি হেসে বলল "তুই আজো তেমনি আগের মতই আছিস? পুলিশের চাকরিটা তোকে একটু ও বদলাতে পারল না।" পিয়ালী হাসতে হাসতে বলল "তোকেও কি কুলে তুলে নিব নাকি?"

অপু চটজলদি দু-পা পিছিয়ে গিয়ে বলল "না বাবা, ওতেই থাক। আমাকে আর কুলে তুলতে হবে না।"

মিলি পিয়ালীর কুলে ভাবতে লাগল পুলিশের এমন কাণ্ডের কথা তো কখনো শুনিনি। একটু পরে পিয়ালী হাঁপিয়ে উঠে বলল "চল বাবা এবার কুল থেকে নীচে নেমে, পাশে বস। কিন্তু যেতে তো পারবেই না।"

একটা প্রাণবন্ত মানুষ তার চারিদিকটাকেই প্রাণবন্ত করে রাখে। তেমনি পিয়ালী যতক্ষণ ছিল, হাসি-ঠাট্টাতে ঘরটা যেন একটা সুখের মেলায় পরিণত করে গিয়েছিল।

(৮ম পর্ব)

পিয়ালী চলে যাবার পর অপু মিলিকে পিয়ালীর অনেক কথা বলল। পিয়ালী কেমন মজাদার মেয়ে, কেমন হাসিমুখো মেয়ে। দুই বোন মিলে অনেক হাসাহাসি করল। সন্ধ্যা হতেই মিলি তার দিদিমণির কাছ থেকে বিদায় নিলো। রাতে সে বাবাকে দিনের সকল কথা বলল। নতুন বই এর কথা, পড়াশুনার কথা, সেই পুলিশের কথা, পিয়ালীর কথা।

ব্রজহরি মেয়ের কথা শুনে খুব হাসল। বাবা আর মেয়েতে খুব গল্প হল অনেক রাত পর্যন্ত।

ওদিকে রায় বাড়িতেও হাল-চাল চলছিল। কাল ভোরে অপু, উপেন রায় আর বিমলা আবার শহরে ফিরে যাচ্ছেন। জামা-কাপড়, বই-পত্র সব গোছানোর কাজ চলছে। সব গোছাতে গোছাতে অনেক রাত হয়ে গেল। সন্ধ্যার পরেই সব চাকর-বাকরকে ডেকে যার যার কাজ ভাগ করে দেওয়া হল। কোথায় কে কাজ করবে? কোন কোন জিনিস গুলির দিকে লক্ষ রাখতে হবে সব বুঝিয়ে দেওয়া হল। সেই রকম টাকা-পয়সা ও মিলিয়ে দেওয়া হল তাদের। আর সব কিছু দেখাশুনা এবং পরিচালনার ভার শ্রীবল্লুকে দেওয়া হল। সব কিছুর শেষে অপু গোপনে শ্রীবল্লুকে গোপনে কিছু নির্দেশ দিল।

ভোর হতে মোটরে চড়ে তিনজন শহরে বেড়িয়ে গেলেন। আজ অপুর মনে ফিরে যাওয়ার এক দুঃখের সাথে সাথে ফিরে পাওয়ার এক আনন্দ ও বিরাজ করেছে। সে মোটরের জানালা দিয়ে অপলক মা'র পানে তাকিয়ে ছিল। যতক্ষণ নদীটা দেখা যায় সে তাকে দেখল। শেষে বড় রাস্তা ধরে গাড়িটা হু-হু করে ছুটতে লাগল।

মিলির ঘুম থেকে উঠতে আজ অনেক দেরী হল। ব্রজহরি তাকে ডাক না দিলে সে হয়ত এখনো ঘুমিয়েই থাকত। মিলি চোখে খুলে দেখল বেলা অনেক হয়ে গেছে। সে লাফিয়ে উঠল আর চটজলদি স্নানাদির জন্য ছুটল। ব্রজহরি তৈরী হয়ে বসে মেয়ের জন্য অপেক্ষা করেতে লাগল। মিলি ও খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে গেল। শেষ কিছু একটা মুখে দিয়ে বাবার সাথে তাল মিলিয়ে মিলিও ধীর পায়ে রায় বাড়ির দিকে চলল।

রায় বাড়ির সদর দরজায় আজকে সেই পুরানো দারোয়ানটা নেই। নতুন দারোয়ান। সে মিলি আর ব্রজহরির পথ আটকাল। কি চাই? কাকে চাই?

মিলিঃ আমার নাম মিলি। ইনি আমার বাবা শ্রীব্রজহরি। আমি দিদিমণির সাথে দেখা করতে চাই। আর ইনি এখানে কাজ করেন।

দারোয়ানঃ দিদিমণি তো এখানে নেই। সবাই তো সকালেই শহরে চলে গেছেন। তবু একটু দাঁড়াও আমি শ্রীবন্ধুকে জিজ্ঞাস করে আসি।

মিলি আর ব্রজহরি হঠাৎ যেন চমকে উঠল। সবাই শহরে চলে গেছে? কিছু না বলে হঠাৎ?

দারোয়ান কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরে এল। সে বলল "হ্যাঁ, সবাই তো সকালেই শহরে চলে গেছে। কবে ফিরবেন তা জানা নেই। তবে ব্রজহরিকে কাজে রেখে গেছেন। তবে উনার পয়সা পরে দেওয়া হবে।"

ব্রজহরি বলল "ঠিক আছে, বেশ কথা।" তারপর সে মিলির দিকে ফিরে বলল "তুই কিছু ভাবিস না মা। বাড়ি ফিরে যা। বিকেলে আবার দেখা হবে।" কতক কি ভাবত ভাবতে ব্রজহরি রায় বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

মিলি তেমনি কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। সে যেন কথাটা বিশ্বাসই করেতে পারছেনা। দিদি চলে গেল অথচ আমাকে একটি বার কিছু বলল ও না। হঠাৎ যেন তার মনটা একদম খালি খালি হয়ে গেল। পৃথিবীটাই যেন খালি খালি মনে হল। দিদির জন্য চোখের কোনায় বার বার জল আসছিল তার। মনে অনেক প্রশ্ন আসছিল, আবার নিজেই তার উওর দিচ্ছিল।

দিদিকে যে আবার শহরে চলে যেতে হবে এই কথাটাই সে কখনো মনে করেনি। আজ এত তাড়াতাড়ি রায় বাড়ির দরজা থেকে ফিরে যেতে হবে সে ভাবেনি। মিলি তেমনি ধীর পায়ে বাড়ির দিকে ফিরে চলল।

নদীর সেই মোড়ে এসে মিলি মাথা তুলে নদীটার দিকে চাইল। নদীটা তেমনি দিনের আলোয় চকচক করছে। দিদি যে শহরে চলে গেছে বড়মা কেন বুঝতে চাইছে না। তার জল যেন তেমনি সদাকার মত নেচে নেচে বয়ে যাচ্ছে। হাওয়ারা যেন বাকী সময়ের মত আনন্দে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আবার উড়ে যাচ্ছে। মিলির মনটা যে আজ এত খালি ওরা কেন বুঝছে না? মিলি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ঐ নদীটার দিকে। তার মনে হল বড়মা যেন আদর করে তাকে কাছে ডাকছে। মিলিকে সে যেন কিছু বলতে চাইছে।

মিলি ধীর পায়ে এগিয়ে গেল তার বড়মার দিকে। কিনারায় গিয়ে অনেকক্ষণ উদাস বসে রইল। বারে বারে দিদির কথাই মনে পড়ছে। সেই প্রথম দেখা, সেই ঠাকুরের অনুষ্ঠান, সেই নতুন জামা কাপড়। সব একে একে তার মনে হতে লাগল। নাঃ তবু যেন মন হাল্কা হল না।

অনেকক্ষণ বসে থেকে সে নদীর আরো কাছে গিয়ে দিদির মতই নদীর জলে হাত রাখল। কিছুক্ষণ নদীর জলে হাত নড়াচড়া করার পর হঠাৎ তার মন যেন তাকে বলতে লাগল "আরে তুই কি এত ভাবছিস? সে কি আর তোদের ছেড়ে, নিজের মাকে ছেড়ে দূরে থাকতে পারে। খুব তাড়াতাড়িই সে ফিরে আসবে। তাকে আসতেই হবে।" নিজের মনে নিজেই এ কথাটা ভেবে নিজেই সে চমকে উঠল। একটা খুশির বাতাস, একটা বিজলী হঠাৎ তার ভাবনার উপর দিয়ে যেন চলে গেল। আর তার মনটা চোখের পলকেই পাল্টে গেল। সে আপন মনেই হেসে উঠল।

মিলির মনের উদাস ভাবটা আর তেমন রইল না। সে বড়মাকে প্রণাম করে হাসি মুখে ঘরে ফিরে গেল। অসময়ে মিলিকে ঘরে দেখে আধা অন্ধ মা বলল "কি রে কি হল? আজ এত সকাল সকাল ফিরে এলি যে?"

মিলিঃ দিদি শহরে চলে গেছে। কবে আসবে কে জানে? আমাকে অনেক কাজ দিয়ে গেছে সে গুলি করতে হবে?

ব্রজহরিঃ অপু শহরে চলে গেছে?

ব্রজহরিও হঠাৎ একটা ধাক্কা খেল মনে। এই ক'দিন সে বেশ খুশিই ছিল। তার দিকে যেন ভগবান মুখ তুলে দেখেছিলেন। একটা ছোট শিশুর উপর এক সৎমা যে অত্যাচার করেছে তার সাজা তো সে অনেক দিন ধরে পেয়ে আসছে। এবার তার প্রাশ্চিত্য করার একটা সুযোগ এসেছে সেটা আবার হারিয়ে না যায়! তবু অপু যে বেঁচে আছে, মরে যায়নি সেদিন, এই কথাটা ভেবেই তার মনে আনন্দ হয়। তা না হলে তাকে এই দুঃখ নিয়েই মরতে হত আর সংসারটা ও জ্বলে পুরে ছাই হয়ে যেত।

মিলি দিদির দেওয়া কাজ করতে বসল। সেই বইয়ের ব্যাগ খুলে, বই খাতা সব বের করে পড়তে বসে গেল। ব্রজহরি একেবারে কাছে এসে ভাল করে দেখল মেয়ে কি করছে। তারপর একটু হেসে দূরে গিয়ে বসল। কিছুই বলল না শুধু মনে মনে বলল "বেশ খাসা কাজ পেয়েছিস মা। ভাল করে পড়।"

মিলি পড়তে লাগল। দিদি যা-যা দেখিয়ে গিয়েছিল তাই-তাইই পড়তে লাগল, লিখতে লাগল। হঠাৎ হঠাৎ আবার মনটা দিদির জন্য উদাস ও হয়ে যাচ্ছিল। সে ভাবছিল দিদি না জানি এখন কি করছে? আমাদের কথা মনে পড়ছে দিদির? একটু উদাস থেকে

আবার সে ফিরে ফিরে আসছে পড়াশুনায়। দিদি চলে যাবার কথাটা সেদিন গোপন রেখে তবেই পড়াশুনার গুরুত্ব নিয়ে এত কথা বলেছিল। না দিদির দেওয়া কাজটা তার ভাল করে শেষ করতেই হবে। দিদি যেন বুঝে তার ছোট বোন তার সব কথা শুনে।

শহরে এসে উপেন রায় নিজের কাজে লেগে গেলেন। বিমলাও নিজের কাজে লেগে গেলেন। শুধু অপু ঠিক ভাবে নিজের কাজে লাগতে পারল না। বারে বারেই মিলির কথা, বাবার কথা, দুই মায়ের কথা তার মনে পড়ছে। মনটা বেশ ভারী ভারি লাগছে। সে অনেকক্ষণ নিজের ঘরেই এটা ওটা করল। কিন্তু কোন কাজেই মন দিতে পারল না। মনে হচ্ছিল যদি সাথে করে মিলিকে নিয়েই আসত তবে ভালই ছিল। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর সে মার সাথে বসে গল্প করতে লাগল। ঈশানপুরের গল্প, মিলির গল্প। বিমলা ঠিক বুঝল যে অপুর মন জুড়ে মিলি বসে আছে। তবে কখনো কখনো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গেলে এমন হয় আবার কয়েক দিন পরে সব আপনিই ঠিক হয়ে যায়।

(৯ম পর্ব)

একদিন গেল, দুদিন গেল, তিনদিন গেল। ঈশানপুরটা বেশ খালি খালি লাগছে মিলির। সে দিদির দেওয়া পড়াশুনা তো করছে। কিন্তু তবু যেন নিজেকে খোঁজে পাচ্ছে না। ভোর হলেই সেই নদীর পারে বড়মার কাছে একটা চক্কর মেরে আসে। মনে মনে বড়মাকে অনুরোধ করে তাড়াতাড়ি দিদিকে পাঠিয়ে দিতে। আবার বিকেল বেলাতে বড়মার কাছে যায়। উদাস চোখে বড়মাকে দেখে। বিকেলে ব্রজবাসী হঠাৎ মিলিকে বলল "মা, আমাকে কি নিয়ে একটু তোর বড়মার কাছে নিয়ে যাবি। মনে বড় বোঝা লাগছে। তোর বড়মার

কাছে একটু ক্ষমা চেয়ে নেব।" মিলি মার হাত ধরে ধীরে ধীরে মাকে বড়মার কাছে নিয়ে গেল। গোমতী আজ কারোর চোখে মা, কারোর চোখে বড়মা, কারোর চোখে দিদি।

ব্রজবাসী হাত জোড় করে প্রণাম করল। তার প্রায় দৃষ্টি-শক্তি হীন দুটি আঁখি থেকে গর-গর করে জল ধারা নেমে এল। মাকে কাঁদতে দেখলে কোন সন্তান কি ঠিক থাকতে পারে? মিলির চোখ বেয়েও জল ধারা নেমে এল। সে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল "কেঁদো না মা। তুমি কাঁদলে যে আমার খুব কষ্ট হয়। তাইই আমি তোমাকে এখানে নিয়ে আসতে চাইছিলাম না।"

ব্রজবাসী নিজের মেয়ের হাতটা ধরে বললেন "না রে মিলি। আমি বুকের আগুনটা আর আমি সইতে পারছিলাম না। কার কাছে খুলে বলি নিজের বুকের জ্বালা? কে বুঝবে বুকের কথা? পৃথিবীতে আমি তো একটা বোঝা। না পারি কোন কাজ করতে, না পারি কারোর কাজে কোন সাহায্য করতে। ভগবানের কাছে সদাই প্রার্থনা করি যেন আমাকে তাড়া-তাড়ি কাছে ডেকে নেন।" মিলি মাকে জড়িয়ে ধরে বলল "এ কি তুমি বলছ মা? নিরাশ হইও না, তুমি আবার ঠিক হবে। আবার তুম দেখতে পাবে।"

সূর্য প্রায় ডুবে ডুবে। মিলি মা'র হাত ধরে ধীরে ধীরে বাড়ির পথে পা বাড়াল। নদীর ধার থেকে পথে উঠে সে এদিক ওদিক তাকিয়ে বাড়ির দিকে একটু যেতেই তার মনে হল সে যেন দিদির মত কাউকে অনেক দূরে এদিকে আসতে দেখেছে। প্রথমে সে এতটা খেয়াল করেনি। কথাটা তার মনে হতেই যেন ঠন করে তার মগজ বাজল। সে দ্রুত ফিরে তাকাল সে দিকে। দিদিকে চিনতে তার আর সময় লাগেনি। যেন সারা পথ জুরে একটা চাঁদ উঠেছে। মিলি এক ঝটকায় মা'র হাতটা ছেড়ে এক শিশুর মত সোজা

দৌড়। ব্রজবাসী বলতে লাগল "আরে মিলি আমাকে ছেড়ে কোথায় যাচ্ছিস? আয় মা কাছে আয়।"

মিলি হাঁক দিয়ে বলল "তুমি একটু দাঁড়াও মা আমি আসছি। কোথাও যাবে না এখান থেকে।" এই অল্প পথের দূরত্বটা যেন আর ফুরাচ্ছেনা। মিলি প্রাণ-পণে ভাগছে দিদির দিকে। মিলিকে ঝড়ের বেগে আসতে দেখে অপু তার দুই বাহু বাড়ায়ে বোনের জন্য দাঁড়িয়ে রইল। মিলি একটা দমকা হাওয়ার মত ছুটতে ছুটতে এসে অপুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। অপুও অসীম স্নেহে বোনটিকে আঁকড়ে ধরে রাখল। কারোর মুখেই যেন কথা সরে না। দুদিনের এক স্বল্প বিরাম যেন এক সহস্র যুগের মিলন নিয়ে এল।

মিলি যেন এক অমূল্য ধন পেয়েছে। সে এক তৃপ্তির হাসি হেসে বলল "দিদিমণি, আপনাকে ছাড়া আমার একটু ও ভাল লাগছিল না। সব ঈশানপুরটাই যেন খালি খালি লাগছিল।" অপু ও বোনের দুই গালে চুমু দিতে দিতে বলল "তোমাকে ছাড়াও তো আমার এক মুহূর্ত ভাল লাগছিল না। সব সময় মনে হচ্ছিল কি যেন হারিয়ে গেছে? কি যেন হারিয়ে গেছে? তাই তো চলে এলাম।"

মিলিঃ কিন্তু আপনি এলেন কখন?

অপুঃ এই তো আজ দুপরেই এলাম।

এত কথার খুশির মাঝে মিলি খেয়াল করেনি পাশে কে আছে? এত খুশির মাঝেও যখন সে ভাল করে তার মুখটা দেখল মিলির মুখের হাসিটা খানিক হাওয়া হয়ে গেল। শিবানী দাঁড়িয়ে আছে। আজ পুলিশের পোষাকে নয়। তবে তেমনি তেজ চাউনি। পিছনে নন্দুও আছে।

মিলির চোখ শিবানীর উপর যেতেই শিবানী মিলিকে এক টানে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল "দিদিমণির সাথে তো তোমার অনেক কথা-সাক্ষাৎ হল। এবার আমার সাথে কথা-সাক্ষাৎ হোক। কি বল?" মিলি কি বলবে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না কি সবাই হেসে উঠল।

হাসি-ঠাট্টা, আনন্দ–খুশির সব কথা বলাবলি করতে করতে তারা ব্রজবাসীর কাছে চলে এল। ব্রজবাসীকে এখানে দেখে অপু যেন একটু থমকে গেল। সে প্রথমে ব্রজবাসীকে লক্ষ্য করেনি। মিলি দিদিমণির হাতটা ধীরে মা'র হাতে দিয়ে বলল "দেখতো মা, চিনতে পার কি না?" ব্রজবাসীর হাসি মুখটা একটু পরে যেন বিষণ্ন হয়ে গেল। তার দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে ঐ দুটি হাত হাতে নিয়েই বলল "ভাল থাক মা। ভাল থাক। তোমার সব দুঃখ যেন আমার হয়ে যায়। তুমি যে দিকেই যাও তোমায় যেন সদা জয় হয়।"

অপু ছলছল চোখে মা'কে আবার প্রণাম করল। মিলিকে বলল "রাত হয়ে এল, মাকে নিয়ে বাড়ি যাও। কাল সকালে কথা হবে।" মিলি মা'র হাত ধরে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। অপু তাকিয়ে থাকল তার আপনজনদের দিকে। একে একে চারিদিকে তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বলে উঠতে লাগল। গায়ের বধূদের উলুধ্বনি আর শঙ্খ-ঘন্টার শব্দ চারিদিকে হাওয়ার মাঝে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। অপু দূর থেকেই আজ তার মাকে দেখল, প্রণাম করল। তারপর ফিরে চলল রায় বাড়ির দিকে।

(১০ম পর্ব)

সকাল সকাল মিলি পৌঁছে গেল রায় বাড়িতে। দিদিমণি এখনো ঘুম থেকে উঠেনি। মিলি বারান্দার চেয়ারে বসে রইল। হঠাৎ পিছনে হাজির শিবানী। মিলি এমন চমকাল যেন সে বাঘ দেখতে পেয়েছে। ভয়ে সে মাথা নিচু করে, পাথরের মত চুপ-চাপ বসে রইল। শিবানী কাছে এল, বড়ই আদরে মিলির মাথাতে হাত রাখল। আজ আর সে কিছু বলল না মিলিকে। শুধু তার দুই গালে দুটি চুমু খেল। ছলছল চোখে চেয়ে রইল মিলির দেকে।

মিলি ভাবছে এ পাগলের আজ এ কি হল? এ আবার তার কি রূপ? কিন্তু সে জানে না তার দিদিমণি শিবানীকে রাতে সব কথা খুলে বলে দিয়েছে। শিবানী রাতে আর ঠিক ঘুমাতে পারেনি। সকাল সকাল গ্রামের এই মলিন, দরিদ্র মুখটা তার কাছে একটা চাঁদের টুকরার মতই মনে হল। সারা রাত যার কথা সে ভেবেছে সকাল সকাল তাকে এত কাছে পেয়ে সে যেন তার আদর, মমতা সব গোপনে লুটিয়ে দিতে চাইল। জলে ভরে এল শিবানীর চোখ। সে অনেকক্ষণ মিলিকে নিজের বুকে চেপে ধরে রাখল। মিলির মনে হল ঠিক যেন তার দিদিমণি তাকে আকরে ধরে রেখেছে। দিদিকে ছাড়া এই যেন প্রথম একটা নিরাপদ স্থান খুঁজে পেল মিলি। সেও আঁকড়ে ধরল শিবানীকে। পৃথিবীতে রক্তের সম্পর্কই সব নয়। আপন করে নিলেই আপন হওয়া যায়। শিবানী মনে মনে এই ছোট বোনটির হাত চিরদিনের জন্য নিজের হাতে নিলো। মনে মনে মিলিও ভাবতে লাগল, তার মত এত সুখী এই পৃথিবীতে আজ কেউ নেই। তার দুই হাত যেন দুই দিদির হাতে। তারা যেদিকে নিয়ে যাবে সে সেই দিকে যাবে। সে নিজেকে সঁপে দিল দিদিদের হাতে।

অপু কখন তাদের পাশে এসে দাঁড়াল তারা বুঝতেই পারল না। অপু শিবানীকে চিমটি কাটতেই শিবানীর হুঁশ ফিরে এল। আর সে তার তাগড়া এক হাতে অপুকেও ঝাপটে ধরল। দুই বোন শিবানীর হাত-ফাঁস থেকে বাঁচতে মুড়ামুড়ি দিতে লাগল। শেষে হাসতে হাসতেই শিবানী তাদের ছেড়ে দিল। বলল "মনে হল দুটি পিঁপড়াকে ধরলাম।"

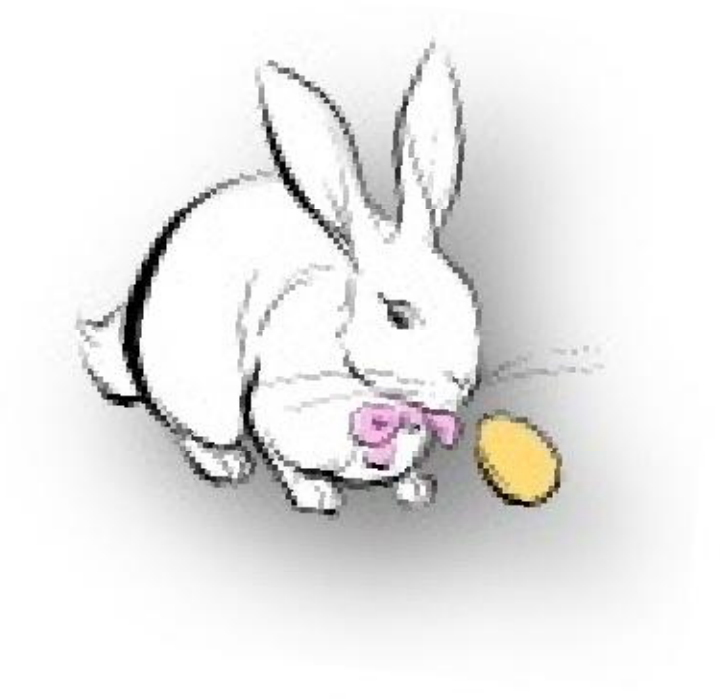

সমাপ্ত